# সূর্যমুখী

( বিষবৃক্ষ )

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আদিত্য প্রকাশালয়
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

চতুর্থ প্রকাশ :
মার্চ, ১৯৬০

প্রকাশক :
শ্রীহরিপদ বিশ্বাস
আদিত্য প্রকাশালয়
২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর :
শ্রীমতী রাধারাণী ভদ্র
সুশীল প্রিণ্টার্স
২, ঈশ্বর মিল বাই লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬

# সূর্য্যমুখী

নগেন্দ্র দত্ত নৌকরোহণে যাইতেছিলেন। জ্যৈষ্ঠমাস, তুফানের সময়। ভার্য্যা সূর্যমুখী মাথার দিব্যি দিয়া বলিয়া দিয়াছেন, "দেখিও নৌকা সাবধানে লইয়া যাইও, তুফান দেখিলে লাগাইও। ঝড়ের সময় কখনও নৌকায় থাকিও না।" নগেন্দ্র স্বীকৃত হইয়া নৌকারোহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় না গেলেও নহে, অনেক কাজ ছিল।

নগেন্দ্রনাথ মহাধনবান ব্যক্তি, তাঁহার বাসস্থান গোবিন্দপুর। যে জেলায় সেই গ্রাম, তাহার নাম গোপন রাখিয়া, হরিপুর বলিয়া তাহার বর্ণনা করিব। নগেন্দ্র বাবু যুবা পুরুষ, বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বর্ষ মাত্র। নগেন্দ্রনাথ আপনার বজরায় যাইতেছিলেন।

নগেন্দ্র প্রথম দুই এক দিন দেখিতে দেখিতে গেলেন। পরে এক দিন মেঘে আকাশ ঢাকিল, নদীর জল কালো হইল, মেঘের কোলে বক উড়িল, নদী নিস্পন্দ হইল। নগেন্দ্র নাবিকদিগকে আজ্ঞা করিলেন, "নৌকাটা কিনারায় বাঁধিও।" রহমৎ আর কখনও মাঝিগিরি করে নাই—তাহার নানার খালা মাঝির মেয়ে ছিল। তিনি সেই গর্বে মাঝিগিরির উমেদার হইয়াছিলেন, কপালক্রমে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। রহমৎ হাঁকেডাকে খাট নত, নামাজ সমাপ্ত হইতে বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন "ভয় কি হুজুর! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" রহমৎ মোল্লার এত সাহসের কারণ এই যে, কিনারা অতি নিকট। অবিলম্বেই কিনারায় নৌকা কাছি করিল।

বোধহয় রহমৎ মোল্লার সঙ্গে দেবতার কিছু বিবাদ ছিল। আগে ঝড় আসিল, পরে বৃষ্টি। মাঝিরা পাল মুড়ি দিয়া বসিল। বাবু-ভৃত্যেরা নৌকা সজ্জা সকল রক্ষা করিতে লাগিল।

নগেন্দ্র বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। নৌকা হইতে ঝড়ের ভয়ে নামিলে নাবিকেরা কাপুরুষ মনে করিবে—না নামিলে সূর্য্যমুখীর কাছে মিথ্যা-বাদী হইতে হয়। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন, "তাহাতেই বা ক্ষতি কি?" আমরা জানি না, কিন্তু নগেন্দ্র ক্ষতি বিবেচনা করিতেছিলেন। এমন

সময়ে রহমৎ মোল্লা বলিল, "হুজুর, পুরাতন কাছি কিজানি কি হয়, ঝড় বাড়িল, নৌকা হইতে নামিলে ভাল হইত।" সুতরাং নগেন্দ্র নামিলেন।

নিরাশ্রয় নদীতীরে ঝড়-বৃষ্টিতে দাঁড়ান কাহারও সুসাধ্য নহে, তারপর সন্ধ্যা হইল, ঝড় থামিল না, সুতরাং আশ্রায়ানুসন্ধানে যাওয়া কর্তব্য বিবেচনা করিয়া নগেন্দ্র গ্রামাভিমুখে চলিলেন। নদীতীর হইতে গ্রাম কিছু দূরবর্তী; নগেন্দ্র পদব্রজে কর্দমময় পথে চলিলেন। বৃষ্টি থামিল। ঝড়ও অল্পমাত্র রহিল; কিন্তু আকাশে মেঘ পরিপূর্ণ। সুতরাং রাত্রে আবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। নগেন্দ্র চলিলেন, ফিরিলেন না।

ক্রমে নগেন্দ্র দূরে একটা আলো দেখিতে পাইলেন। জলপ্লাবিত ভূমি অতিক্রম করিয়া বৃক্ষচ্যুত বারি কর্তৃক সিক্ত হইয়া বৃক্ষতলস্থ শৃগালের ভীতি বিধান করিয়া নগেন্দ্র সেই আলোকাভিমুখে চলিলেন। বহুকষ্টে আলোকাসান্নিধ্যে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, এক ইষ্টক নির্মিত প্রাচীন বাসগৃহ হইতে আলো নির্গত হইতেছে। গৃহের দ্বারা মুক্ত। নগেন্দ্র ভৃত্যকে বাহিরে রাখিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন গৃহের অবস্থা ভয়ানক।

গৃহটি নিতান্ত সামান্য নহে। কিন্তু এখন তাহাতে সম্পদ লক্ষণ কিছুই নাই। প্রকোষ্ঠ সকল ভগ্ন, মলিন, মনুষ্যসমাগম চিহ্নবিরহিত। একটিমাত্র কক্ষে আলো জ্বলিতেছিল। সেই কক্ষমধ্যে নগেন্দ্র প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, কক্ষমধ্যে মনুষ্যজীবনোপযোগী দুই একটা সামগ্রী আছে মাত্র। কিন্তু সকল সামগ্রী দারিদ্র্যব্যঞ্জক। দুই একটা হাঁড়ি—একটা ভাঙ্গা উনান, তিন-চারি খান তৈজস—ইহাই গৃহালঙ্কার। এক ছিন্ন শয্যায় একজন প্রাচীন শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। চক্ষু ম্লান, নিঃশ্বাস প্রখর, ওষ্ঠ কম্পিত। শয্যাপার্শ্বে গৃহচ্যুত ইষ্টক-খণ্ডের উপর একটি মৃন্ময় প্রদীপ, তাহাতে তৈলাভাব; শয্যাপরিস্থ জীবন-প্রদীপও তাহাই। শয্যাপার্শ্বে আর একটি প্রদীপ ছিল—এক অনিন্দিত—গৌরকান্তি স্নিগ্ধজ্যোতির্ময়রূপিণী বালিকা।

তৈলহীন প্রদীপের জ্যোতিঃ অপ্রখর বলিয়াই হউক, অথবা গৃহবাসী দুইজন আশুভাবী বিরহের চিন্তায় প্রগাঢ়তর বিমনা থাকার কারণেই হউক, নগেন্দ্রকে কেহই দেখিল না। তখন নগেন্দ্র দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সেই প্রাচীনের মুখনির্গত চরমকালীন দুঃখের কথা শুনিতে লাগিলেন। এই দুই জন, প্রাচীন এবং বালিকা, এই বহুলোকপূর্ণ লোকালয়ে নিঃসহায়। একদিন ইহাদিগের সম্পদ ছিল; লোক-জন, দাস-দাসী, সহায়-সৌষ্ঠব সব ছিল। কিন্তু চঞ্চলা কমলার কৃপায়, সঙ্গে সঙ্গে একে একে সকলই গিয়াছিল। সদ্যঃসমাগত দারিদ্রের পীড়নে পুত্রকন্যার মুখ-মণ্ডল হিমনিষিক্ত পদ্মবৎ দিন দিন ম্লান দেখিয়া অগ্রেই গৃহিণী নদী-সৈকতশয্যায় শয়ন করিলেন। আর সকল তারাগুলিও সেই চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে নিভিল। এক বংশধর পুত্র, মাতার চক্ষের মণি, পিতার বার্দ্ধক্যের ভরসা, সে-ও পিতৃসমক্ষে চিতারোহণ করিল। কেহ রহিল না, কেবল প্রাচীন আর এই লোকমনোমোহিনী বালিকা সেই বিজনবেষ্টিত ভগ্নগৃহে বাস করিতে লাগিল। পরস্পর পরস্পরের একমাত্র উপায়। কুন্দনন্দিনী বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছিল, কিন্তু কুন্দ পিতার অন্ধের যষ্ঠি এই সংসারবন্ধনের একমাত্র গ্রন্থি; বৃদ্ধপ্রাণ ধরিয়া তাহাকে পরহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলেন না। "আর কিছুদিন যাক, কুন্দকে বিলাইয়া কোথায় থাকিব? কি লইয়া থাকিব? বিবাহের কথা মনে হইলে, বৃদ্ধ এইরূপ ভাবিতেন। এ কথা তাঁহার মনে হইত না যে, যে দিন তাঁহার ডাক পড়িবে সে দিন কুন্দকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন? আজি অকস্মাৎ যমদূত আসিয়া শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল। তিনি তো চলিলেন। কুন্দনন্দিনী কাল কোথায় দাঁড়াইবেন?

এই গভীর অনিবার্য যন্ত্রণা মুমূর্ষুর প্রতি নিশ্বাসে ব্যক্ত হইতেছিল। অবিরল মুদ্রিতোন্মুখ নেত্রে ধারা পড়িতেছিল; আর শিরোদেশে প্রস্তর-ময়ী মূর্তির ন্যায় সেই ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা, স্থিরদৃষ্টে মৃত্যু-মেঘাচ্ছন্ন পিতৃমুখপ্রতি চাহিয়াছিল। আপনা ভুলিয়া, কাল কোথা যাইবে তাহা ভুলিয়া, কেবল গমনোন্মুখের মুখ প্রতি চাহিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধের

বাক্যস্ফূর্তি অস্পষ্টতর হইতে লাগিল। নিঃশ্বাস কণ্ঠাগত হইল, চক্ষু নিস্তেজ হইল ; ব্যথিত প্রাণ ব্যথা হইতে নিষ্কৃতি পাইল। সেই নিভৃত কক্ষে, স্তিমিত প্রদীপে কুন্দনন্দিনী একাকিনী পিতার মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া রহিলেন। বাহিরে এখনও বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছিল, বায়ু রহিয়া রহিয়া গর্জন করিতেছিল, ভগ্নগৃহের কবাটসকল শব্দিত হইতেছিল। গৃহমধ্যে নির্বাণোন্মুখ চঞ্চল ক্ষীণ প্রদীপালোক ক্ষণে-ক্ষণে শব মুখে পড়িয়া আবার অন্ধকারবৎ হইতেছিল। সে প্রদীপে অনেকক্ষণ তৈল নাই। এই সময় দুইচারিবার উজ্জ্বলতর হইয়া নিভিয়া গেল।

নগেন্দ্র নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গৃহদ্বার হইতে অপসৃত হইলেন।

নিশীথ-সময়। ভগ্নগৃহমধ্যে কুন্দনন্দিনী ও তাহার পিতার শব। কুন্দ ডাকিল, "বাবা"! কেহ উত্তর দিল না। কুন্দ একবার মনে করিল পিতা ঘুমাইলেন, আবার মনে করিল, বুঝি মৃত্যু—কুন্দ সে কথা স্পষ্ট মুখে আনিতে পারিল না, অন্ধকারে ব্যঞ্জনহস্তে যেখানে তাহার পিতা জীবিতাবস্থায় শয়ান ছিলেন, এক্ষণে যেখানে তাঁহার শব পড়িয়াছিল, সেখানে বায়ুসঞ্চালন করিতে লাগিল। নিদ্রাই শেষ স্থির করিল, কেননা মরিলে কুন্দের দশা কি হইবে ? দিবারাত্র জাগরণে বালিকার তন্দ্রা আসিল। নিদ্রাকর্ষণ হইলে কুন্দনন্দিনী তালবৃন্তহস্তে সেই অনাবৃত কঠিন শীতল হর্ম্ম্যতলে আপন মৃণালনিন্দিত বাহুপরি মস্তকরক্ষা করিয়া নিদ্রা গেল।

তখন কুন্দনন্দিনী স্বপ্ন দেখিল, যেন রাত্রি অতি পরিষ্কার জ্যোৎস্নাময়ী। নীল আকাশমণ্ডলে যেন বৃহৎ চন্দ্রমণ্ডলের বিকাশ হইয়াছে। এত বড় চন্দ্রমণ্ডল কুন্দ কখনও দেখে নাই। কিন্তু সেই রমণীয় প্রকাণ্ড চন্দ্রমণ্ডল মধ্যে চন্দ্র নাই তৎপরিবর্তে কুন্দ মণ্ডলমধ্যবর্তিনী এক অপূর্ব জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তি দেখিল। সেই জ্যোতির্ময়ী ক্রমে ধীরে ধীরে নীচে নামিতেছিল। ক্রমে সেই চন্দ্রমণ্ডল সহস্রশীতলশ্মি স্ফুরিত করিয়া কুন্দনন্দিনীর মস্তকের উপর আসিল। তখন সে দেখিল যে, সেই মণ্ডলমধ্যশোভিনী মূর্তি

স্ত্রীলোকের আকৃতিবিশিষ্টা। কারুণ্যপূর্ণ মুখমণ্ডল, স্নেহপূর্ণ হাস্য অধরে স্ফুরিত হইতেছে। তখন কুন্দ সানন্দে চিনিল যে, তাহার বহুকালমৃত প্রসূতির অবয়ব ধারণ করিয়াছে। স্বপ্নে কুন্দকে ভূতল হইতে উত্থিতা করিয়া লইলেন এবং মাতৃহীনা কুন্দ বহুকাল পরে "মা" কথা মুখে আনিয়া যেন চরিতার্থ হইল। পরে জ্যোতির্ম্মণ্ডলমধ্যস্থা কুন্দের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "বাছা! তুই বিস্তর দুঃখ পাইয়াছিস। আমি জানি যে, তুই বিস্তর দুঃখ পাইবি। তোর এই বালিকাবয়ঃ, তোর শরীরে সে দুঃখ সহিবে না। অতএব তুই আর এখানে থাকিস না, পৃথিবী ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে আয়।" কুন্দ যেন ইহাতে উত্তর করিল যে, "কোথায় যাইব?" তখন কুন্দের জননী ঊর্দ্ধে অঙ্গুলীনির্দ্দেশ দ্বারা নক্ষত্রলোক দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—"ঐ দেশে।" কুন্দ তখন কহিল, "আমি অত দূর যাইতে পারিব না, আমার বল নাই।" তখন ইহা শুনিয়া তিনি মৃদুগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "বাছা, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহা কর। কিন্তু আমার সঙ্গে আসিলে ভাল করিতে। ইহার পর তুমি ঐ নক্ষত্র-লোকের প্রতি চাহিয়া তথায় আসিবার জন্য কাতর হইবে। আসিবার জন্য কাঁদিবে, তখন আমি আবার দেখা দিব, তখন আমার সঙ্গে আসিও। এখন তুমি আমার অঙ্গুলীসঙ্কেতনীতনয়নে আকাশ প্রান্তে চাহিয়া দেখ। আমি তোমাকে দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখাইতেছি। এই দুই মনুষ্যই ইহলোকে তোমার শুভাশুভের কারণ হইবে। যদি পার তবে ইহাদিগকে বিষধরবৎ প্রত্যাখ্যান করিও। তাহারা যে পথে যাইবে, সে পথে যাইও না।

তখন জ্যোতির্ম্ময়ী অঙ্গুলীসঙ্কেত দ্বারা গগনোপ্রান্ত দেখাবেন। কুন্দ দেখিল, নীল গগনপটে এক দেবনিন্দিত পুরুষমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। তাঁহার উন্নত ললাট, সরল সকরুণ কটাক্ষ; তাঁহার মরালবৎ দীর্ঘ ঈষৎ-বঙ্কিম গ্রীবা। কাহারও বিশ্বাস হইতে পারে না যে, ইহা হইতে আশঙ্কা সম্ভব। তখন ক্রমে ক্রমে সে প্রতিমূর্ত্তি গগনপটে বিলীন হইলে, জননী কহিলেন, ইহার দেবকান্তি রূপ দেখিয়া ভুলিও না। ইনি মহাসদাশয় হইলেও তোমার অমঙ্গলের কারণ। অতএব বিষধরবোধে ইহাকে ত্যাগ

করিও।" পরে আলোকময়ী পুনশ্চ—"ঐ দেখ বলিয়া" গগনপ্রান্তে নির্দ্দেশ করিলে, কুন্দ দ্বিতীয় মূর্ত্তি আকাশের নীলপটে চিত্রিত দেখিল। কিন্তু এবার পুরুষমূর্ত্তি নহে। কুন্দ তথায় এক উজ্জল শ্যামাঙ্গী, পদ্ম-পলাশনয়না যুবতী দেখিল। তাহাকে দেখিয়াও কুন্দ ভীতা হইল না। জননী কহিলেন, "এই শ্যামাঙ্গী নারীবেশে রাক্ষসী। ইহাকে দেখিলে পলায়ন করিও।"

ইহা বলিতেই সহসা আকাশ অন্ধকারময় হইল, বৃহচ্চন্দ্রমণ্ডল আকাশে অন্তর্হিত হইল এবং তৎসহিত তেজোময়ীও অন্তর্হিতা হইলেন। তখন কুন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

নগেন্দ্র গ্রামমধ্যে গমন করিলেন। শুনিলেন গ্রামের নাম ঝুমঝুমপুর। তাঁহার অনুরোধে এবং আনুকূল্যে গ্রামস্থ কেহ কেহ আসিয়া মৃতের সৎকারের আয়োজন করিতে লাগিল। একজন প্রতিবেশিনী কুন্দনন্দিনীর নিকট রহিল।

প্রভাতে প্রতিবেশিনী আপন গৃনকার্যে গেল, কুন্দনন্দিনীর সান্ত্বনার্থ আপন কন্যা চাঁপাকে পাঠাইয়া দিল। চাঁপা কুন্দের সমবয়স্কা। চাঁপা আসিয়া কুন্দের সঙ্গে নানাবিধ কথা কহিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কিন্তু দেখিল যে, কুন্দ কোন কথাই শুনিতেছে না। চাঁপা কৌতূহল প্রযুক্ত জিজ্ঞাসা করিল "একশ'বার আকাশপানে চাহিয়া কি দেখিতেছ?"

কুন্দ তখন কহিল, "আকাশ থেকে কাল মা আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে ডাকিলেন, 'আমার সঙ্গে আয়!' আমার কেমন দুর্বুদ্ধি হইল আমি ভয় পাইলাম, মার সঙ্গে গেলাম না।"

চাঁপা কহিল, "হ্যাঁ! মরা মানুষ না কি আবার আসিয়া থাকে!"

তখন কুন্দ স্বপ্নবৃত্ত্যান্ত সকল বলিল। শুনিয়া চাঁপা বিস্মিত হইয়া কহিল, "সেই আকাশের গায়ে যে পুরুষ আর মেয়েমানুষ দেখিয়াছিলে তাহাদের চেন?"

কুন্দ। না তাহাদের আর কখনও দেখি নাই। সেই পুরুষের মত সুন্দর পুরুষ যেন কোথাও নাই। এমন রূপ কখনও দেখি নাই।

এদিকে নগেন্দ্র প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া গ্রামস্থ সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মৃতব্যক্তির কন্যার কি হইবে? সে কোথায় থাকিবে? তাহার কে আছে?" ইহাতে সকলেই উত্তর করিল যে "উহার থাকিবার স্থান নাই, উহার কেহ নাই।" তখন নগেন্দ্র কহিলেন, "তবে তোমরা উহাকে পালন কর, উহার বিবাহ দিও, তাহার ব্যয় আমি দিব। আর যতদিন তোমাদিগের বাটিতে থাকিবে ততদিন আমি তাহার ভরণপোষণের জন্য মাসিক কিছু টাকা দিব।"

নগেন্দ্র যদি নগদ টাকা ফেলিয়া দিতেন, তাহা হইলে অনেকেই তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইতে পারিত। সুতরাং নগদ টাকা না দেখিয়া কেহই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল না।

একজন বলিল, "শ্যামবাজারে ইহাই এক মাসীর বাড়ী আছে। বিনোদ ঘোষ ইহার মেসো। আপনি কলিকাতায় যাইতেছেন, যদি ইহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া সেইখানে রাখিয়া আসেন, তবেই এই কায়স্থকন্যার উপায় হয়।"

অগত্যা নগেন্দ্র এই কথায় স্বীকৃত হইলেন এবং কুন্দকে এই কথা বলিবার জন্য তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

আসিতে আসিতে দূর হইতে নগেন্দ্রকে দেখিয়া কুন্দ অকস্মাৎ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইল। পা সরিল না। সে নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল।

চাঁপা কহিল, "ও কি দাঁড়ালি যে?"

কুন্দ অঙ্গুলীনির্দ্দেশের দ্বারা দেখাইয়া কহিল, "এ-ই সে-ই।"

চাঁপা কহিল, "এই কে?" কুন্দ কহিল—"যাহাকে মা কাল রাত্রে আকাশের গায়ে দেখাইয়াছিলেন।"

অগত্যা নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। প্রথমে

তাহার মেসো বিনোদ ঘোষের অনেক সন্ধান করিলেন। শ্যামবাজারে বিনোদ ঘোষ নামে কাহাকেও পাওয়া গেল না। সুতরাং কুন্দ নগেন্দ্রের গলায় পড়িল।

নগেন্দ্রের এক সহোদরা ভগিনী ছিলেন। তাঁহার নাম কমলমণি। তাঁহার শ্বশুরালয় কলিকাতায়। শ্রীশচন্দ্র মিত্র তাঁহার স্বামী। নগেন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্প্রীতি। কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্র সেইখানে লইয়া গেলেন। কমলকে ডাকিয়া কুন্দের সবিশেষ পরিচয় দিলেন।

কমলের বয়স অষ্টাদশ বৎসর। মুখাবয়ব নগেন্দ্রের ন্যায়। কিন্তু কমলের সৌন্দর্য্যগৌরবের সঙ্গে বিদ্যার খ্যাতিও ছিল। নগেন্দ্রের পিতা একজন শিক্ষাদাত্রী নিযুক্ত করিয়া কমলমণিকে এবং সূর্য্যমুখীকে বিশেষ যত্নে লেখা-পড়া শিখাইয়াছিলেন।

নগেন্দ্র কুন্দের পরিচয় দিয়া কহিলেন, "এখন তুমি ইহাকে না রাখিলে আর রাখিবার স্থান নাই। পরে আমি যখন বাড়ী যাইব— উহাকে গোবিন্দপুরে লইয়া যাইব।"

কমল স্বহস্তে কুন্দকে স্নান করাইল—কুন্দ শিশিরধৌত পদ্মবৎ শোভা পাইতে লাগিল। তখন কমল তাহাকে শ্বেত চারুবস্ত্র পরাইয়া গন্ধতৈল সহিত কেশ রচনা করিয়া কতকগুলি অলঙ্কার পরাইয়া দিয়া বলিলেন "যা এখন দাদাবাবুকে প্রণাম করিয়া আয়; আর দেখিস্— যেন এই বাড়ীর বাবুকে প্রণাম করে ফেলিস্ না। এ বাড়ীর বাবু দেখলেই বি'য়ে করে ফেলবে।"

নগেন্দ্রনাথ কুন্দের সকল কথা সূর্য্যমুখীকে লিখিলেন। হরদেব ঘোষাল নামে তাঁহার এক প্রিয় সুহৃদ্ দূর দেশে বাস করিতেন। নগেন্দ্র তাঁহাকেও পত্র লেখার কালে কুন্দনন্দিনীর কথা বলিলেন।

নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, কিছুদিন পরে তাহার উত্তর আসিল। উত্তর এইরূপ—

"দাসী শ্রীচরণে কি অপরাধ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতায় যদি তোমার এতদিন থাকিতে হইবে, তবে আমি কেনই বা

নিকটে গিয়া পদসেবা না করি ? এ বিষয়ে আমার বিশেষ মিনতি ; হুকুম পাইলেই ছুটিব।

"একটি বালিকা কুড়াইয়া পাইয়া কি আমাকে ভুলিলে ? অনেক জিনিসের কাঁচারই আদর। নইলে বালিকাটি পাইয়া আমাকে ভুলিবে কেন।

তামাসা যাউক, তুমি কি মেয়েটিকে একেবারে বিলাইয়া দিয়াছ ? নইলে আমি সেটি তোমার কাছে ভিক্ষা করিয়া লইতাম। মেয়েটিতে আমার কাজ আছে।

আমি তারাচরণের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিব। তারাচরণের জন্য একটি ভাল মেয়ে কত খুঁজিতেছি, যদি আর একটি ভাল মেয়ে বিধাতা মিলাইয়াছেন, তবে আমাকে নিরাশ করিও না। কমল যদি ছাড়িয়া দেয়, তবে কুন্দনন্দিনীকে আসিবার সময়ে সঙ্গে করিয়া আনিও। আমি কমলকে অনুরোধ করিয়া লিখিলাম।"

তারাচরণ কে, তাহা পরে প্রকাশ করিব। কিন্তু সে যেই হউক সূর্য্যমুখীর প্রস্তাবে নগেন্দ্র এবং কমলমণি উভয়ে সম্মত হইলেন। সুতরাং স্থির হইল যে নগেন্দ্র যখন বাড়ী যাইবেন, তখন কুন্দকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন, সকলেই সম্মত হইয়াছিলেন। কমলও কুন্দের জন্য কিছু গহনা গড়াইতে দিলেন। কিন্তু মনুষ্য তো চিরান্ধ ! কয়েক বৎসর পরে এমন দিন আসিল, যখন কমলমণি ও নগেন্দ্র ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কপালে করাঘাত করিয়া ভাবিলেন যে, কি কুক্ষণে কুন্দনন্দিনীকে পাইয়াছিলাম। কি কুক্ষণে সূর্য্যমুখীর পত্রে সম্মত হইয়াছিলাম।

এখন কমলমণি, সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্র তিনজনে মিলিত হইয়া বিষবীজ রোপণ করিলেন। পরে তিনজনেই হাহাকার করিবেন।

এখন বজরা সাজাইয়া নগেন্দ্র কুন্দকে লইয়া গোবিন্দপুরে যাত্রা করিলেন।

কুন্দ স্বপ্ন প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। নগেন্দ্রের সঙ্গে যাত্রাকালে একবার তাহা স্মরণপথে আসিল। কিন্তু নগেন্দ্রের কারুণ্যপূর্ণ মুখকান্তি

এবং লোকবৎসল চরিত্র মনে করে কুন্দ কিছুতেই বিশ্বাস করিল না যে, ইহা হইতে তাহার অনিষ্ট হইবে।

সূর্য্যমুখীর পিতা একজন ভদ্রকায়স্থ। সূর্য্যমুখী তাঁহার একমাত্র সন্তান। শিশুকালে শ্রীমতী নামে এক বিধবা কায়স্থ কন্যা দাসীভাবে তাঁহার গৃহে থাকিয়া সূর্য্যমুখীকে লালন-পালন করিত। শ্রীমতির একটি শিশুসন্তান ছিল, তাহারই নাম তারাচরণ।

শ্রীমতী বিশেষ রূপবতী ছিল, সুতরাং অচিরাৎ বিপদে পতিত হইল। গ্রামস্থ একজন দুশ্চরিত্র ধনীব্যক্তির চক্ষে পড়িয়া সে সূর্য্যমুখীর পিতার গৃহ ত্যাগ করিয়া কোথায় গেল, কেহ জানিতে পারিল না। কিন্তু শ্রীমতী আর— ।

শ্রীমতী তারাচরণকে ফেলিয়া গিয়াছিল। সূর্য্যমুখীর পিতা অতি দয়ালু ছিলেন। তিনি ঐ অনাথ বালককে সন্তানবৎ পালন করিলেন এবং তাহাকে লেখাপড়া শিক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। তারাচরণ এক অবৈতনিক মিশনারী স্কুলে ইংরেজী শিখিতে লাগিল।

পরে সূর্য্যমুখীর বিবাহ হইল। তাহার কয়েক বৎসর পরে তাহার পিতার পরলোক গমন হইল। তখন তারাচরণ একপ্রকার ইংরেজী শিখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন কর্মকার্যের সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। নিরাশ্রয় হইয়া তিনি সূর্য্যমুখীর কাছে গেলেন। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রকে দিয়া গ্রামে একটি স্কুল স্থাপিত করাইলেন। তারাচরণ তাহাতে মাষ্টার নিযুক্ত হইলেন।

কুন্দ নগেন্দ্র দত্তকে সঙ্গে করিয়া গোবিন্দপুরে আসিল। কুন্দ নগেন্দ্রের বাড়ী দেখিয়া অবাক হইল। এত বড় বাড়ী সে কখনও দেখে নাই।

কুন্দনন্দিনী বিস্মিতনেত্রে নগেন্দ্রের অপরিমিত ঐশ্বর্য দেখিতে দেখিতে শিবিকারোহণে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। সে সূর্য্যমুখীর

নিকট আনত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। সূর্য্যমুখী আশীর্বাদ করিলেন।

নগেন্দ্রের সঙ্গে স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষরূপের সাদৃশ অনুভব করিয়া কুন্দ-নন্দিনীর মনে মনে এমন সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, তাহার পত্নী অবশ্য তৎপরদৃষ্টা স্ত্রীমূর্তির সদৃশরূপা হইবেন; কিন্তু সূর্য্যমুখীকে দেখিয়া সে সন্দেহ দূর হইল। সূর্য্যমুখীর সঙ্গে সে মূর্তির কোন সাদৃশ নাই দেখিয়া কুন্দ স্বচ্ছন্দচিত্ত হইল।

সূর্য্যমুখী কুন্দকে সম্ভাষণ করিয়া, তাহার পরিচর্যার্থ দাসীদিগকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, এবং তন্মধ্যে যে প্রধানা, তাহাকে করিলেন "এই কুন্দের সঙ্গে আমি তারাচরণের বিবাহ দিব। অতএব ইহাকে তুমি আমার ভাইয়ের মত যত্ন করিবে।"

দাসী স্বীকৃতা হইল। কুন্দকে সে সঙ্গে করিয়া কক্ষান্তরে চলিল। কুন্দ ততক্ষণে তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিয়া তাহার শরীর কণ্টকিত এবং স্বেদাক্ত হইল। যে স্ত্রীমূর্তি কুন্দ স্বপ্নে আকাশপটে দেখিয়াছিল এই দাসীই সেই।

কুন্দ ভীতিবিহ্বলা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গো?"

দাসী কহিল, "আমার নাম হীরা।"

কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্র বাড়ী লইয়া আসিলে, তারাচরণের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল। তারাচরণ সুন্দরী স্ত্রী ঘরে লইয়া গেলেন। কিন্তু সুন্দরী স্ত্রী লইয়া তিনি এক বিপদে পড়িলেন। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে যে, তারাচরণের স্ত্রীশিক্ষা ও জেনানা ভাঙ্গার প্রবন্ধসকল প্রায়ই দেবেন্দ্রবাবুর বৈঠকখানাতেই পড়া হইত। তৎ-সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ককালে মাষ্টার সর্বদাই দম্ভ করিয়া বলিতেন যে, কখনও যদি আমার সময় হয় তবে এ বিষয়ে প্রথম রিফরম করার দৃষ্টান্ত দেখাইব। আবার বিবাহ হইলে স্ত্রীকে সকলের সম্মুখে বাহির করিব।" এখন ত বিবাহ হইল,—কুন্দনন্দিনীর সৌন্দর্যের খ্যাতি ইয়ারমহলে প্রচারিত হইল। সকলে

প্রাচীন গীত কোট্ করিয়া বলিল, "কোথা রহিল সে পণ ?" দেবেন্দ্র বলিলেন, "কৈ হে, তুমি ওল্‌ড ফুলদের দলে ? স্ত্রীর সহিত আমাদের আলাপ করিয়া দাও না কেন।" তারাচরণ বড় লজ্জিত হইলেন দেবেন্দ্রবাবুর অনুরোধে ও বাক্যযন্ত্রণা এড়াইতে পারিলেন না। দেবেন্দ্রের সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর সাক্ষাৎ করাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ভয় পাছে সূর্য্যমুখী শুনিয়া রাগ করে। এই মত টাল-মাটাল করিয়া বৎসরাবধি গেল। তাহার পর আর টাল-মাটালে চলে না দেখিয়া বাড়ী মেরামতের ওজর করিয়া তারাচরণ কুন্দকে নগেন্দ্রের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। বাড়ি মেরামত হইল। কুন্দকে আবার আনিতে হইল। তখন দেবেন্দ্র একদিন স্বয়ং সদলবলে তারাচরণের আলয়ে উপস্থিত হইলেন এবং তারাচরণকে মিথ্যা দাম্ভিকতার জন্য ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন। তখন অগত্যা তারাচরণ কুন্দনন্দিনীকে সাজাইয়া আনিয়া দেবেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্র তাহার নবযৌবন-সঞ্চারের অপূর্ব শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। সে শোভা আর ভুলিলেন না।

ইহার কিছুদিন পরে দেবেন্দ্রের বাটীতে কোন ক্রিয়া উপস্থিত। তাঁহার বাটী হইতে একটি বালিকা কুন্দকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিল। কিন্তু সূর্য্যমুখী তাহা শুনিতে পাইয়া নিমন্ত্রণে যাওয়া নিষেধ করিল। সুতরাং যাওয়া হইল না।

ইহার পর আর একবার দেবেন্দ্র তারাচরণের গৃহে আসিয়া কুন্দের সঙ্গে পুনরালাপ করিয়া গেলেন। লোকমুখে সূর্য্যমুখী তাহাও শুনিলেন। শুনিয়া তারাচরণকে এমন ভর্ৎসনা করিলেন যে, শেষ পর্যন্ত কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে দেবেন্দ্রের আলাপ বন্ধ হইল।

বিবাহের পর তিন বৎসরকাল কাটিল। তারপর কুন্দনন্দিনী বিধবা হইলেন। জ্বরবিকারে তারাচরণের মৃত্যু হইল। সূর্য্যমুখী কুন্দকে আপন বাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন। তারাচরণকে যে বাড়ী করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বেচিয়া কুন্দকে কাগজ করিয়া দিলেন।

পাঠক মহাশয় বড় বিরক্ত হইলেন সত্য, কিন্তু এত দূরে আখ্যায়িকা আরম্ভ হইল—এত দূরে বিষবৃক্ষের বীজবপন হইল।

বিধবা কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের গৃহে কিছুদিন কালাতিপাত করিল। এক দিন মধ্যাহ্নের পর প্রৌঢ়া-স্ত্রীরা সকলে মিলিত হইয়া পুরাতন অন্তঃপুরে বসিয়াছিল। ঈশ্বরকৃপায় তাহারা অনেকগুলি ; সকলে স্ব স্ব মনোমত গ্রাম্য স্ত্রী-সুলভ কার্যে ব্যাপৃতা ছিল। সূর্য্যমুখী এ সভায় ছিল না। সকলেই তাঁকে ভয় করিত, তাঁহার নিকট মন খুলিয়া সকল কথা বলিত না। কুন্দনন্দিনীর এক্ষণে এই সম্প্রদায়েই থাকিত, এখনও ছিল। একটি বালককে তাহার মাতার অনুরোধে ক-খ শিখাইতেছিল।

এমন সময়ে সেই নারীসভামণ্ডলে "জয় রাধে" বলিয়া এক বৈষ্ণব আসিয়া দাঁড়াইল।

নগেন্দ্রের ঠাকুরবাড়ীতে নিত্য অতিথিসেবা হইত, বৈষ্ণবী কেহ অন্তঃপুরে আসিতে পাইত না। এই জন্য অন্তঃপুরমধ্যে "জয় রাধে" শুনিয়া একজন পুরবাসিনী বলিতেছিল,—"কে রে মাগী বাড়ীর ভিতর ? ঠাকুরবাড়ী যা।" কিন্তু এই কথা বলিতে গিয়া সে মুখ ফিরাইয়া বৈষ্ণবীকে দেখিয়া কথা আর সমাপ্ত করিল না ; তৎপরিবর্তে বলিল, "ও মা। এ আবার কোন্ বৈষ্ণবী গো !"

সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল যে বৈষ্ণবী যুবতী, তাহার শরীরে আর রূপ ধরে না। সেই বহুসুন্দরীশোভিত রমণীমণ্ডলেও কুন্দনন্দিনী ব্যতীত তাহা হইতে সমধিক রূপবতী কেহই নহে।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একজন বয়োজ্যেষ্ঠা কহিল,—"হ্যাঁ, গা, তুমি কে গো ?"

বৈষ্ণবী কহিল, "আমার নাম হরিদাসী বৈষ্ণবী, মা ঠাকুরাণী গান শুনবে ?"

তখন সকলেই বলিল, "শুন্‌বো গো শুন্‌বো"। খঞ্জনী হাতে বৈষ্ণবী উঠিয়া গিয়া ঠাকুরাণীদিগের কাছে বসিল।

বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল, "কি গায়িব ?" তখন শ্রোত্রীগণ নানাবিধ

ফরমায়েস আরম্ভ করিলেন ; কেহ চাহিলেন—গোবিন্দ অধিকারী—কেহ গোপাল উড়ে।

বৈষ্ণবী সকলের হুকুম শুনিয়া কুন্দের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিল, "হ্যাঁ গা—তুমি কিছু ফরমায়েস করিলে না ?" কুন্দ অল্প একটু হাসিল কিছু উত্তর করিল না ; কিন্তু তখনই একজন বয়স্কার কানে কানে কহিল—"কীর্তন গায়িতে বল না ?"

হরিদাসী প্রথমে খঞ্জনীতে দুই একবার অঙ্গুলি প্রহার করিল। পরে আপন কণ্ঠমধ্যে অতি মৃদু মৃদু এক ভ্রমরীর গুঞ্জনবৎ সুরের আলাপ করিতে লাগিল—যেন লজ্জাশীলা বালিকা স্বামীর নিকট প্রথমে প্রেমব্যক্ত মুখ ফুটাইতেছে।

বৈষ্ণবী গীত সমাপন করিলে, পৌরস্ত্রীগণ তাহাকে গাহিবার জন্য পুনশ্চ অনুরোধ করিল। তখন হরিদাসী সতৃষ্ণবিলোলনেত্রে কুন্দনন্দিনীর মুখপানে চাহিয়া পুনশ্চ কীর্তন আরম্ভ করিল—

'শ্রীমুখপঙ্কজ—দেখবো ব'লে হে,
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে ?
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে।'

গীত সমাপ্ত হইলে বৈষ্ণবী কুন্দনন্দিনীর মুখপ্রতি চাহিয়া বলিল, "গীত গাহিয়া আমার মুখ শুকাইতেছে, আমায় একটু জল দাও।"

কুন্দ পাত্রে করিয়া জল আনিল। বৈষ্ণবী কহিল—তোমাদিগের পাত্র আমি ছুঁইব না, আসিয়া আমার হাতে ঢালিয়া দাও ; আমি, জাত বৈষ্ণবী নহি।

এই কথা শুনিয়া কুন্দ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ জল ফেলিবার স্থানে গেল। যেখানে অন্য স্ত্রীলোকেরা বসিয়া রহিল, সেস্থান এরূপ ব্যবধান যে তথায় মৃদু কথা কহিলে কেহ শুনিতে পায় না। সেই স্থানে গিয়া কুন্দ বৈষ্ণবীর হাতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল। বৈষ্ণবী হাতমুখ ধুইতে লাগিল। ধুইতে ধুইতে বৈষ্ণবী মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল, "তুমি না কি গা কুন্দ ?"

কুন্দ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন গা ?

বৈষ্ণবী। তোমার শাশুড়ীকে কখনও দেখিয়াছ ?

কুন্দ। না।

বৈষ্ণবী। তোমার শাশুড়ী এখানে আসিয়াছেন। তিনি আমার বাড়ীতে আছেন, তোমাকে একবার দেখিতে চান—আহা। হাজার হোক শাশুড়ী। সে ত আর এখানে আসিয়া তোমাদের গিন্নীর কাছে পোড়ার মুখ দেখাইতে পারিবে না—তা তুমি একবার আমার সঙ্গে গিয়ে তাকে দেখা দিয়ে এস না ?

কুন্দ সরলা হইলেও বুঝিল যে, শাশুড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধস্বীকারই অকর্ত্তব্য। বৈষ্ণবীর কথায় ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিল।

কিন্তু বৈষ্ণবা ছাড়ে না—পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিল। তখন কুন্দ কহিল—আমি গিন্নীকে না বলিয়া যাইতে পারি না।

হরিদাসী মানা করিল। বলিল—"গিন্নীকে বলিও না। যাইতে দিবে না। হয়ত তোমার শাশুড়ীকে আনিতে পাঠাইবে, তাহা হইলে তোমার শাশুড়ী দেশছাড়া হইয়া পলাইবে।"

বৈষ্ণবী যতই দার্ঢ্য প্রকাশ করুক, কুন্দ কিছুতেই সূর্য্যমুখীর অনুমতি ব্যতীত যাইতে সম্মত হইল না। তখন অগত্যা হরিদাসী বলিল—আচ্ছা, তবে তুমি গিন্নীকে ভাল করিয়া বলিয়া রাখিও। আমি আর একদিন আসিয়া লইয়া যাইব।

কুন্দ ইহাতে স্বীকৃত হইল না। তখন হরিদাসী হস্ত-মুখ প্রক্ষালন সমাপ্ত করিয়া অন্দরের কাছে ফিরিয়া আসিয়া পুরস্কার চাহিল। এমন সময়ে সেখানে সূর্য্যমুখী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বাজে কথা, একেবারে বন্ধ হইল।

সূর্য্যমুখী হরিদাসীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "তুমি কে গা ?" তখন নগেন্দ্রের এক মামী কহিলেন—ও একজন বৈষ্ণবী, গান করিতে আসিয়াছে। গান সে সুন্দর গায়! এমন গান কখনও শুনি নাই মা! তুমি একটি শুনিবে! গা তো হরিদাসী।

হরিদাসী বৈষ্ণবী দত্তদিগের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেবীপুরের দিকে গেল। দেবীপুরে বিচিত্র লৌহ-রেইল পরিবেষ্টিত এক পুষ্পোদ্যান আছে। হরিদাসী সেই পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিল এবং বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া এক নিভৃত কক্ষে গিয়া বেশ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইল। অকস্মাৎ সেই নিবিড় কেশদাম রচিত কবরী মস্তকচ্যুত হইয়া পড়িল, সে ত পরচুলা মাত্র। বক্ষ হইতে স্তন যুগল খসিল—তাহা বস্ত্রনির্মিত। বৈষ্ণবী পিতলের বালা ও জলতরঙ্গ চুড়ি খুলিয়া ফেলিল—রসকলি ধুইল। তখন উপযুক্ত পরিচ্ছেদ পরিধানান্তর বৈষ্ণবীর স্ত্রীবেশ ঘুচিয়া এক অপূর্ব সুন্দর যুবা পুরুষে দাঁড়াইল। এই যুবা পুরুষ দেবেন্দ্রবাবু। পূর্ব্বেই তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

দেবেন্দ্র এবং নগেন্দ্র উভয়েই একবংশসম্ভূত, কিন্তু বংশের উভয় শাখার মধ্যে পুরুষানুক্রমে বিবাদ চলিতেছে। এমন কি দেবীপুরের বাবুদিগের সঙ্গে গোবিন্দপুরের বাবুদিগের মুখের আলাপ পর্য্যন্ত ছিল না। পুরুষানুক্রমেই দুই শাখায় মোকদ্দমা চলিতেছে। শেষে এক বড় মোকদ্দমায় নগেন্দ্রের পিতামহ দেবেন্দ্রের পিতামহকে পরাজিত করায় দেবীপুরের বাবুরা একেবারে হীনবল হইয়া পড়িলেন। উভয় বংশে আর কখনও মিল হইল না। দেবেন্দ্রের পিতা ক্ষুণ্ণ ধনগৌরব পুনরুদ্ধিত করিবার জন্য এক উপায় করিলেন। গণেশবাবু নামে আর একজন জমিদার হরিপুর জেলার মধ্যে বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র অপত্য হৈমবতী। দেবেন্দ্রের সঙ্গে হৈমবতীর বিবাহ দিলেন। হৈমবতীর অনেক গুণ—সে কুরূপা, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী, আত্মপরায়ণা। যখন দেবেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ হইল, তখন পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। লেখাপড়ায় তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল এবং প্রকৃতিও সুধীর ও সত্যনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু সেই পরিণয় তাঁহার কাল হইল। যখন দেবেন্দ্র উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন দেখিলেন যে, ভার্য্যার গুণে গৃহে তাঁহার কোনও সুখেরই আশা নাই। বয়োগুণে

তাঁহার রূপতৃষ্ণা জন্মিল, কিন্তু আত্মগৃহে তাহা ত নিবারণ হইল না। বয়োগুণে দম্পতি প্রণয়াকাঙ্ক্ষা জন্মিল—কিন্তু অপ্রিয়বাদিনী হৈমবতীকে দেখিবামাত্র সে আকাঙ্ক্ষা দূর হইত। সুখ দূরে থাকুক—দেবেন্দ্র দেখিল যে, হৈমবতীর রসনাবর্ষিত বিষের জ্বালায় গৃহে তিষ্ঠান ভার। একদিন হৈমবতী দেবেন্দ্রকে এক কদর্য্য কটুবাক্য কহিল। দেবেন্দ্র অনেক সহিয়াছিলেন—আর সহিলেন না। হৈমবতীর কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে পদাঘাত করিলেন এবং সেই দিন হইতে গৃহত্যাগ করিয়া পুষ্পোদ্যানমধ্যে বাসোপযোগী গৃহ-প্রস্তুতের অনুমতি দিয়া কলিকাতায় গেলেন। ইতিপূর্ব্বেই দেবেন্দ্রের পিতার পরলোকগমন হইয়াছিল, সুতরাং দেবেন্দ্র এক্ষণে স্বাধীন। কলিকাতায় পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া দেবেন্দ্র অতৃপ্ত বিলাসতৃষ্ণা নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

সর্ব্বশেষে দেবেন্দ্রের সমবয়স্ক, সুশীতলকান্তি এক যুবা পুরুষ আসিয়া বসিলেন। ইনি দেবেন্দ্রের মাতুলপুত্র সুরেন্দ্র ; গুণে সর্ব্বাংশে দেবেন্দ্রর বিপরীত। ইহার স্বভাবগুণে দেবেন্দ্রও ইহাকে ভালবাসিতেন। দেবেন্দ্র ইহার ভিন্ন সংসারে—আর কাহারও কথার বাধ্য নহেন। সুরেন্দ্র প্রত্যহ রাত্রে একবার দেবেন্দ্রের সংবাদ লইতে আসিতেন। কিন্তু মদ্যাদির ভয়ে অধিকক্ষণ বসিতেন না। সকলে উঠিয়া গেলে সুরেন্দ্র দেবেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমার শরীর কিরূপ আছে ?"

দে। শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্।

সু। তোমার আজ জ্বর দেখিয়াছিলে ?

দে। না।

সু। আর যকৃতের সেই ব্যথাটা ?

দে। পূর্ব্বমতই আছে।

সু। তবে এখন এ সব স্থগিত রাখিলে ভাল হয় না ?

দে। কি—মদ খাওয়া ? কতদিন বলিবে ? ও আমার সাথের সাথী।

সু। সাথের সাথী কেন? সঙ্গে আসে নাই, সঙ্গে যাবেও না। অনেকে ত্যাগ করিয়াছে—তুমিও ত্যাগ করিবে না কেন?

দে। আমি কি সুখের জন্য ত্যাগ করিব? যাহারা ত্যাগ করে, তাহাদের জন্য সুখ আছে—সেই ভরসায় ত্যাগ করে। আমার আর সুখই ত নাই।

সু। তবু বাঁচিবার আশায়, প্রাণের আকাঙ্ক্ষায় ত্যাগ কর।

দে। যাহাদের বাঁচিয়া সুখ, তাঁহারা বাঁচিবার আশায় মদ ছাড়ুক। আমার বাঁচিয়া কি লাভ?

সুরেন্দ্রের চক্ষু বাষ্পাকুল হইল। তখন বন্ধু-স্নেহে পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, "তবে আমাদের অনুরোধে ত্যাগ কর।"

দেবেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। দেবেন্দ্র বলিল, "আমাকে যে সৎপথে যাইতে অনুরোধ করে, তুমি ভিন্ন আর এমন কেহ নাই। যদি কখনও ত্যাগ করি, সে তোমারি অনুরোধে করিব। আর—"

সু। আর কি?

দে। আর যদি কখনও আমার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ কর্ণে শুনি—তবে মদ ছাড়িব, নচেৎ এখন মরি-বাঁচি সমান কথা।

প্রাণাধিকা শ্রীমতী কমলমণি দাসী চিরায়ুষ্মতীষু। আর তোমাকে আশীর্ব্বাদ পাঠ লিখিতে লজ্জা করে। এখন তুমিও একজন হইয়া উঠিয়াছ—এক ঘরের গৃহিণী। তা যাহাই হউক, আমি তোমাকে আমার কনিষ্ঠ ভগিনী ভিন্ন আর কিছুই বলিয়া ভাবিতে পারিতেছি না। তোমাকে মানুষ করিয়াছি, কিন্তু অন্তঃকরণের ভিতর যে কষ্ট, তাহা কাহাকেও না বলিলে সহ্য হয় না। আর কাহাকে বলিব? তুমি আমার প্রাণের ভগিনী—তুমি ভিন্ন আর আমাকে কেহ ভালবাসে না। আর তোমার ভাইয়ের কথা তোমা ভিন্ন পরের কাছেও বলিতে পারি না।

আমি আপনার চিতা আপনিই সাজাইয়াছি। কুন্দনন্দিনী যদি

না খাইয়া মরিত, তাহাতে আমার কি ক্ষতি ছিল? পরমেশ্বর এত লোকের উপায় করিতেছেন, তাহার কি উপায় করিতেন না? আমি কেন আপনা খাইয়া তাহাকে ঘরে আনিলাম?

তুমি সে হতভাগিনীকে যখন দেখিয়াছিলে, তখন সে বালিকা। এখন তাহার বয়স ১৭।১৮ হইয়াছে। সে যে সুন্দরী, তাহা স্বীকার করিতেছি, সেই সৌন্দর্যই আমার কাল হইয়াছে।

তাঁহার নিন্দা করিতেছি না। তিনি ধর্মাত্মা শত্রুতেও তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক এখনও করিতে পারে না। আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই, তিনি প্রাণপণে আপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন। যে দিকে কুন্দনন্দিনী থাকে, সাধ্যানুসারে কখনও সে দিকে নয়ন ফিরান না; নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তাহার নামও মুখে আনেন না। এমন কি, তাহার প্রতি কর্কশ ব্যবহারও করিয়া; তাহাকে বিনাদোষে ভর্ৎসনা করিতেও শুনিয়াছি।

আপনার দুঃখের কথা লইয়া তোমাকে অনেকক্ষণ জ্বালাতন করিয়াছি। তুমি না জানি কত বিরক্ত হইবে। কিন্তু কি করি ভাই —তোমাকে মনের দুঃখ না বলিয়া কাহাকে বলিব? আমার কথা এখন ফুরায় নাই—কিন্তু তোমার মুখ চাহিয়া আজ আমি ক্লান্ত হইলাম। এ সকল কথা কাহাকেও বলিও না। আমার মাথার দিব্য, জামাইবাবুকে এ পত্র দেখাইও না।

তোমার ছেলের সংবাদ ও জামাইবাবুর সংবাদ শীঘ্র লিখিবে, ইতি। সূর্য্যমুখী।"

কমল প্রত্যুত্তরে লিখিলেন—

তুমি পাগল হইয়াছ। নচেৎ তুমি স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী হইবে কেন? স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইও না। আর যদি নিতান্তই সে বিশ্বাস রাখিতে না পার তবে দীঘির জলে ডুবিয়া মর। আমি কমলমণি তর্কসিদ্ধান্ত ব্যবস্থা দিতেছি, তুমি দড়িকলসি লইয়া জলে ডুবিয়া মরিতে পার। স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না—তাহার মরাই মঙ্গল।"

দিনকয় মধ্যে ক্রমে ক্রমে নগেন্দ্রের সকল চরিত্র পরিবর্তিত হইতে লাগিল। নির্ম্মল আকাশে মেঘ দেখা দিল—নিদাঘকালের প্রদোষাকাশের মত অকস্মাৎ সে চরিত্র মেঘাবৃত হইতে লাগিল।

দেখিয়া সূর্য্যমুখী গোপনে আপনার অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। সূর্য্যমুখী ভাবিলেন, "আমি কমলের কথা শুনিব। স্বামীর চিত্তপ্রতি কেন অবিশ্বাসিনী হইব? তাঁহার চিত্ত অচলপর্ব্বত—আমিই ভ্রান্ত বোধ হয়। তাঁহার কোন ব্যামোই হইয়া থাকিবে।" সূর্য্যমুখী বালির বাঁধ বাঁধিল।

ইতিপূর্ব্বে নগেন্দ্র অত্যন্ত শীতলস্বভাব ছিলেন। এখন কথায় কথায় রাগ।

শুধু রাগ নয়। একদিন রাত্রে আহারের সময় অতীত হইয়া গেল, তথাপি নগেন্দ্র অন্তঃপুরে আসিলেন না। সূর্য্যমুখী প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। অনেক রাত্রে নগেন্দ্র আসিলেন; সূর্য্যমুখী দেখিয়া বিস্মিতা হইলেন।

সে অবধি প্রত্যহ এইরূপ হইতে লাগিল। এক দিন সূর্য্যমুখী অনেক অনুনয় করিলেন। বলিলেন—কেবল আমার অনুরোধে ইহা ত্যাগ কর।"

নগেন্দ্র প্রত্যুত্তর করিলেন—"সূর্য্যমুখী, আমি মাতাল, মাতালকে শ্রদ্ধা হয়, আমাকে শ্রদ্ধা করিও, নচেৎ আবশ্যক করে না।"

সূর্য্যমুখী ঘরের বাহিরে গেলেন।

দেওয়ানজী বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "মা-ঠাকুরাণীকে বলিও, বিষয় গেল, আর থাকে না।"

"কেন?"

"বাবু কিছু দেখেন না। সদর মফঃস্বলের আমলারা যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতেছে। কর্ত্তার অমনোযোগে আমাকে কেহ মানে না।"

শুনিয়া সূর্যমুখী বলিলেন, "যাঁহার বিষয়, তিনি রাখেন থাকবে, না হয় গেল গেলই।"

ইতিপূর্ব্বে নগেন্দ্র সকলই তত্ত্বাবধান করিতেন।

একদিন তিন-চার হাজার প্রজা নগেন্দ্রের কাছারীর দরওয়াজায় জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল। "দোহাই হুজুর—নায়েব গোমস্তার দৌরাত্ম্যে আর বাঁচি না। সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল। আপনি না রাখিলে কে রাখে?"

হরদেব ঘোষাল নগেন্দ্রকে লিখিলেন, "তোমার কি হইয়াছে? তুমি কি করিতেছ? আমি কিছু ভাবিয়া পাই না। তোমার পত্র পাই-ই না, যদি পাই তবে ছত্রদুই, তাহার মানে মাথা-মুণ্ডু কিছুই নাই। তাতে কোন কথাই থাকে না। তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ? তা বল না কেন? আর কিছু বল না বল, শারীরিক ভাল আছ কিনা বল।"

নগেন্দ্র উত্তরে লিখিলেন, "আমার উপর রাগ করিও না—আমি অধঃপাতে যাইতেছি।"

হরদেব বড় বিজ্ঞ, পত্র পড়িয়া মনে করিলেন, "কি এ? অর্থ চিন্তা? দেবেন্দ্র দত্ত? না, এ প্রেম?"

কমলমণি সূর্য্যমুখীর আর একখানি পত্র পাইলেন, তাহার শেষ এই—"একবার এস! কমলমণি! ভগিনি! তুমি বই আর আমার সুহৃদ কেহ নাই। একবার এসো।"

গোবিন্দপুরে দত্তদিগের বাড়ীতে যেন অন্ধকারে একটি ফুল ফুটিল! কমলমণির হাসিমুখ দেখিয়া সূর্য্যমুখীরও চক্ষের জল শুকাইল। কমলমণি বাড়িতে পা দিয়াই সূর্য্যমুখীর চুলের গোছ লইয়া বসিয়া গেলেন। অনেকদিন সূর্য্যমুখীর কেশ রচনা করেন নাই। কমলমণি বলিলেন, "দুটো ফুল গুঁজিয়া দিব!" সূর্য্যমুখী তাহার গাল টিপিয়া ধরিলেন। "না! না! কমলমণি লুকাইয়া দুটো ফুল গুঁজিয়া দিলেন। লোক আসিলে বলিলেন—"দেখেছ, মাগী বুড়া বয়সে মাথায় ফুল পরে।"

আলোকময়ীর আলো নগেন্দ্রের মুখমণ্ডলের মেঘেও ঢাকা পড়িল না। নগেন্দ্রকে দেখিয়া কমলমণি ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল। নগেন্দ্র বলিলেন—'কমল? কোথা! কোথা থেকে?' কমল মুখ নত করিয়া নিরীহ ভাল মানুষের মত বলিলেন—"আজ্ঞে খোকা ধরিয়া আনিল?" নগেন্দ্র বলিলেন—"বটে? মার পাজিকে।" এই বলিয়া খোকাকে কোলে লইয়া দণ্ডস্বরূপ তাহার মুখচুম্বন করিলেন। খোকা কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার গায়ে লাল দিল, আর গোঁপ ধরিয়া টানিল।

কুন্দনন্দিনীর সহিত কমলমণির এইরূপ আলাপ হইল - "ওলো কুঁদী—কুঁদী—মুঁদী—হুঁদী—ভাল আছিস্ ত কুঁদী?"

কুঁদী অবাক হইয়া রহিল। কিছুকাল ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "আছি!"

"আছি দিদি—আমায় দিদি বলবি—না বলিস্ তো ঘুমিয়ে থাকবি, আর তোর চুলে আগুন ধরিয়ে দিব। আর নহিলে গায়ে আরশুলা ছাড়িয়া দিব!"

কুন্দ দিদি বলিতে আরম্ভ করিল। যখন কলিকাতায় কুন্দ কমলের কাছে থাকিত তখন কমলকে কিছু বলিত না।

এ দিকে কমলমণি স্বামীর গৃহে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন ঃ সূর্য্যমুখী বলিলেন—"না ভাই! আর দুদিন থাক। তুমি গেলে আর বাঁচিব না। তোমার কাছে সকল কথা বলাও সোয়াস্তি।" কমল বলিলেন, "তোমার কাজ না করিয়া যাইব না।" সূর্য্যমুখী বলিল—আমার কি কাজ করিবে? কমলমণি মুখে বলিলেন, তোমার শ্রাদ্ধ—মনে বলিলেন—তোমার কণ্টকোদ্ধার।

কুন্দনন্দিনী কমলের যাওয়ার কথা শুনিয়া আপনার ঘরে গিয়া লুকাইয়া কাঁদিল, কমলমণি লুকাইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল। কুন্দনন্দিনী বালিশে মাথা দিয়া কাঁদিতেছে, কমলমণি তাহার চুল বাঁধিতে বসিল।

চুল-বাঁধা কমলের একটা রোগ। চুল-বাঁধা সমাপ্ত হইলে, কুন্দের মাথা তুলিয়া, কমল তাহার মস্তক আপনার কোলে রাখিলেন। অঞ্চল

দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। এই সব কাজ শেষ করিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুঁদী, কাঁদিতেছিলি কেন?"

কুন্দ বলিল—তুমি যাবে কেন?

কমলমণি একটু হাসিলেন কিন্তু ফোঁটা দুই চক্ষের জল সে হাসি মানিল না—না বলিয়া কহিয়া তাহারা কমলমণির গণ্ড বাহিয়া হাসির উপর আসিয়া পড়িল। রৌদ্রের উপর বৃষ্টি হইল।

কমলমণি বলিলেন—"তাতে তুই কাঁদিস্ কেন?"

কুন্দ। তুমি আমায় ভালবাস।

ক। কেন—আর কেহ কি ভালবাসে না?

কুন্দ চুপ করিয়া রহিল।

ক। কে ভালবাসে না? গিরি ভালবাসে না—না? আমায় লুকস্‌নে।

কুন্দ নীরব।

কমল। দাদাবাবু ভালবাসে না?

কুন্দ নীরব।

কমল বলিলেন, "যদি আমি তোমায় ভালবাসি—আর তুমি আমায় ভালবাস, তবে কেন আমার সঙ্গে চল না?"

কুন্দ তথাপি কিছু বলিল না। কমল বলিলেন, "যাবে?" কুন্দ ঘাড় নাড়িল—"যাব না।"

কমলের প্রফুল্ল মুখ গম্ভীর হইল।

তখন কমলমণি সস্নেহে কুন্দনন্দিনীর মস্তক বক্ষে তুলিয়া লইয়া ধারণ করিলেন এবং সস্নেহে তাহার গণ্ডদেশ গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "কুন্দ, সত্য বলিবি?"

কুন্দ বলিল, "কি?"

কমল বলিল, "যাহা জিজ্ঞাসা করিব? আমি তোর দিদি—আমার কাছে বলবি না?"

কুন্দ বলিল, "কি বল?"

ক। তুই দাদাবাবুকে বড় ভালবাসিস—না ?

কুন্দ উত্তর দিল না, কমলমণির হৃদয়মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কমল বলিলেন—বুঝেছি—মরিয়াছ! মর তাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেকে মরিবে যে"—

কুন্দনন্দিনী মস্তক উত্তোলন করিয়া কমলের মুখপ্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া রহিল। কমলমণি প্রশ্ন বুঝিলেন। বলিলেন, "পোড়ারমুখী, চোখের মাথা খেয়েছ ? দেখতে পাওনা যে"—মুখের কথা মুখে রহিল, তখন ঘুরিয়া কুন্দের উন্নত মস্তক আবার কমলমণির বক্ষের উপর পড়িল।

কুন্দনন্দিনীর চক্ষু মুছাইয়া কহিল, "কুন্দ !"

কুন্দ আবার মাথা তুলিয়া চাহিল।

ক। আমার সঙ্গে চল।

কুন্দের চক্ষে আবার জল পড়িতে লাগিল! কমল বলিলেন, "নহিলে নয়।—সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেল।"

কুন্দ কাঁদিতে লাগিল। কমল বলিলেন, "যাবি ?"

কুন্দ অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—"যাব।"

অনেকক্ষণ পরে কেন, তাহা কমল বুঝিল। বুঝিল যে কুন্দনন্দিনী পরের মঙ্গলমন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলি দিল।

এমন সময় হরিদাসী বৈষ্ণবী আসিয়া গান করিল ঃ

"কাঁটা বনে তুলতে গেলাম কলঙ্কের ফুল।
গো সখি কলঙ্কের ফুল।
মাথায় পরলাম মালা গেঁথে, কানে পরলাম দুল,
সখি কলঙ্কেরি ফুল।"

এ দিন সূর্য্যমুখী উপস্থিত। তিনি কমলকে গান শুনিতে ডাকিয়া

পাঠাইলেন। কমল কুন্দকে সঙ্গে করিয়া শুনিতে আসিলেন। বৈষ্ণবী গাহিতে লাগিলেন ঃ

"মরি মর্ব কাঁটা ফুটে,
ফুলের মধু খাব লুটে,
খুঁজে বেড়াই কোথায় ফুটে,
নবীন মুকুল।"

কমল ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "গিন্নি মশাই—তোমার প্রবৃত্তি হয়. তোমার বৈষ্ণবীর গান তুমিই শোন, আমি চললাম। এই বলিয়া কমল চলিয়া গেলেন—সূর্য্যমুখীও উঠিয়া গেলেন। আর আর স্ত্রীলোকেরা কেহ উঠিয়া গেল, কেহ রহিল। কুন্দনন্দিনী রহিল। হরিদাসী তখন আর গান করিল না। বাজে কথা আরম্ভ করিল। গান আর হইল না দেখিয়া আর সকলে উঠিয়া গেল। কুন্দ কেবল উঠিল না। তখন কুন্দকে বিরলে পাইয়া হরিদাসী তাহাকে অনেক কথা বলিল। কুন্দ কতক বা শুনিল, কতক বা শুনিল না।

সূর্য্যমুখী ইহা সকলই দূর হইতে দেখিতেছিলেন। যখন উভয়ে গাঢ় মনসংযোগের সহিত কথাবার্ত্তা হওয়ার চিহ্ন দেখিলেন, তখন সূর্য্যমুখী কমলকে ডাকিয়া দেখাইলেন। কমল বলিল, "কথা কহিতেছে—কহুক না। মেয়ে বৈ তো আর পুরুষ না।"

সূর্য্য। মেয়ে কি পুরুষ, তার ঠিক কি ?

কমল বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি ?"

সূর্য্যমুখী। আমার বোধ হয়, কোন ছদ্মবেশী পুরুষ। তাহা এখনি জানিব—কিন্তু কুন্দ কি পাপিষ্ঠা ?

"রসো। আমি একটা বাবলার ডাল আনি। মিন্‌ষেকে কাঁটা ফোটার সুখটা দেখাই।" এই বলিয়া কমল বাবলার ডালের সন্ধানে গেলেন।

তখন সূর্য্যমুখী হীরা দাসীকে ডাকাইলেন।

হীরা বালবিধবা বলিয়া গোবিন্দপুরে পরিচিতা। কেহ কখন

তাহার স্বামীর কোন প্রসঙ্গ শুনে নাই। কিন্তু হীরার চরিত্রেরও কেহ কোন কলঙ্ক শুনে নাই। তবে হীরা অত্যন্ত মুখরা সধবার ন্যায় কেশবিন্যাস করিত এবং বেশবিন্যাসে প্রীতা ছিল।

কিন্তু হীরার অনেক দোষ। তাহা ক্রমে জানা যাইবে। আপাততঃ বলিয়া রাখি, হীরা আতর-গোলাপ দেখিলেই চুরি করে।

সূর্য্যমুখী হীরাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঐ বৈষ্ণবীকে চিনিস্ ?"

হীরা। না। আমি কখনও পাড়ার বাহির হই না।—আমি বৈষ্ণবী ভিখারীকে কিসে চিনব ? ঠাকুরবাড়ীর মাগীদের ডেকে জিজ্ঞাসা কর না। করুণা কি শীতলা জানিতে পারে।

সূর্য্য। এ ঠাকুরবাড়ীর বৈষ্ণবী নয়। এ বৈষ্ণবী কে তোকে জানতে হবে। এ বৈষ্ণবাই বা কে, আর বাড়ীই বা কোথায়, আর কুন্দের সঙ্গে এত ভাবই বা কেন ? এ সকল কথা যদি ঠিক জেনে এসে বলতে পারিস, তবে তোকে নূতন বেনারসা পরাইয়া সং দেখিতে পাঠাইয়া দিব।

নূতন বেনারসীর কথা শুনিয়া হীরার পাঁচ হাত বুক হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "কখন জানতে যেতে হবে ?"

সূর্য্য। তোর যখন খুসি। কিন্তু এখনই ওর পিছু না গেলে, ওর ঠিকানা পাবি না।

হীরা। আচ্ছা।

সূর্য্য। কিন্তু দেখিস, যেন বৈষ্ণবী কিছু বুঝিতে না পারে। আর কেহ কিছু বুঝিতে না পারে।

এমন সময়ে কমল ফিরিয়া আসিল। সূর্য্যমুখী তাহাকে পরামর্শের কথা সব বলিলেন। শুনিয়া কমল খুশি হইলেন।

"কুন্দ কাঁদিতেছ কেন ?" কুন্দ এবার কাঁদিয়া ফেলিল। তখন নগেন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"শুন কুন্দ ! আমি বহু কষ্টে এত দিন

সহ্য করিয়া ছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না। কি কষ্টে যে বাঁচিয়া আছি, তাহা বলিতে পারি না। ইতর হইয়াছি। মদ খাই। আর পারি না। তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। শুন কুন্দ! এখন বিধবাবিবাহ চলিত হইতেছে—আমি তোমাকে বিবাহ করিব। তুমি বলিলেই বিবাহ করি।"

কুন্দ বলিল "না।"

নগেন্দ্র বলিলেন, "কেন কুন্দ? বিধবার বিবাহ কি অশাস্ত্র?"

কুন্দ বলিল—"না।"

নগেন্দ্র বলিল—"তবে না কেন? বল—বল—বল, আমার গৃহিণী হইবে কি না? আমায় ভালবাসিবে কি না।"

কুন্দ বলিল, "না।"

তখন নগেন্দ্র যেন সহস্রমুখে অপরিমিত প্রেমের মর্মভেদী কত কথা বলিলেন। কুন্দ বলিল—না।

হরিদাসী বৈষ্ণবী উপবনগৃহে আসিয়া হঠাৎ দেবেন্দ্রবাবু হইয়া বসিল। পাশে এক আলবোলা।

তখন সুরেন্দ্র আসিয়া দেবেন্দ্রের কাছে বসিলেন, এবং তাহার শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বলিলেন—আবার আজ তুমি কোথায় গিয়াছিলে?

দে। ইহারই মধ্যে তোমার কানে গিয়াছে?

সু। এই তোমার আর একটি ভ্রম। তুমি মনে কর, সব তুমি লুকিয়ে কর—কেহ জানিতে পারে না, কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজে।

দে। দোহাই ধর্ম! আমি কাহাকেও লুকাইতে চাহি না—কোন্ শালাকে লুকাইব?

সুরেন্দ্র দুর্ম্মুখের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন,—"বৈষ্ণবী সেজেছিলে কার সর্ব্বনাশ করবার জন্য।"

দে। তা কি জান না? মনে নাই, তারা মাষ্টারের বিয়ে হয়েছিল এক দেবকন্যার সাথে। সেই দেবকন্যা এখন বিধবা হয়ে ও গাঁয়ের দত্ত বাড়ী রেঁধে খায়। তাই তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

সু। কেন, এত দুর্ব্বৃত্তিতেও তৃপ্তি জন্মিল না যে, সে অনাথা বালিকাকে অধঃপাতে নিতে হবে?

দে। তুমি আমার একমাত্র সুহৃদ। আমি অর্দ্ধেক বিষয় ছাড়িতে পারিব। কিন্তু তোমাকে যদি ছাড়িতে হয়, সেও স্বীকার তবু আমি কুন্দনন্দিনীকে দেখিবার আশা ছাড়িতে পারিব না।

সু। তবে তাহাই হউক। তোমার সঙ্গে আমার এই পর্য্যন্ত।

এই বলিয়া সুরেন্দ্র দুঃখিতচিত্তে উঠিয়া গেলেন। দেবেন্দ্র একমাত্র বন্ধুবিচ্ছেদে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া কিয়ৎকাল বিমর্ষভাবে রহিলেন।

এমন সময়ে জানালার দিকে কি একটা শব্দ হইল—"কে যেন খড়খড়ি তুলিয়া দেখিতেছিল হঠাৎ ফেলিয়া দিল। দেবেন্দ্র বোধ-হয় মনে মনে কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—বলিলেন, কে খড়খড়ি চুরি করে?" কোন উত্তর না পাইয়া জানালা দিয়া দেখিতে পাইলেন, একজন স্ত্রীলোক পলায়মান। দেবেন্দ্র জানালা খুলিয়া লাফাইয়া পড়িয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ টলিতে টলিতে ছুটিলেন।

স্ত্রীলোক পলাইলে অনায়াসে পলাইতে পারিত, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক পলাইল না। দেবেন্দ্র তাহাকে ধরিয়া অন্ধকারে তাহার মুখপানে চাহিয়া চিনিতে পারিলেন না। চুপি চুপি মদের ঝোঁকে বলিলেন, "বাবা! কোন্ গাছ থেকে?" পরে তাহাকে ঘরের ভিতর টানিয়া আনিয়া একবার একদিকের আবার আর এক দিকের গালে ধরিয়া দেখিয়া, সেইরূপ স্বরে বলিলেন, "তুমি কাদের পেত্নী গা?"

তখন সে স্ত্রীলোক ধরা পড়িয়াছে ভাবিয়া বলিল, "আমি হীরা।"

হীরা ইতিপূর্ব্বে বৈষ্ণবীর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দিনমানে জানিয়া গিয়াছিল যে, হরিদাসী বৈষ্ণবী ও দেবেন্দ্রবাবু একই ব্যক্তি। কিন্তু কেন দেবেন্দ্র বৈষ্ণবী-বেশে দত্তগৃহে যাতায়াত করিতেছে, এ কথা

জানা সহজ নহে। হীরা মনে মনে অত্যন্ত দুঃসাহসিক সংকল্প করিয়া এই সময়ে স্বয়ং দেবেন্দ্রের গৃহে আসিল। সুরেন্দ্রের সঙ্গে দেবেন্দ্রের কথোপকথন অন্তারল হইতে শুনিয়া হীরা সিদ্ধমনস্কাম হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল, যাইবার সময় অসাবধানে খড়খড়ি ফেলিয়া দিয়াছিল—ইহাতে গোল বাধিল।

সে রাত্রে হীরা আর দত্তবাড়ীতে গেল না। আপন গৃহে শয়ন করিয়া রহিল। পরদিন প্রাতে গিয়া সূর্য্যমুখীর নিকট দেবেন্দ্রের সংবাদ বলিল।—দেবেন্দ্র কুন্দের জন্য বৈষ্ণবী সাজিয়া যাতায়াত করে। কুন্দ যে নির্দোষী, তাহা হীরাও বলিল না; সূর্য্যমুখীও বুঝিলেন না। হীরা কেন সে কথা লুকাইল—পাঠক তাহা ক্রমে বুঝিতে পারিবেন। সূর্য্যমুখী দেখিয়াছিলেন, কুন্দ বৈষ্ণবীর সঙ্গে চুপি চুপি কথা কহিতেছে—সুতরাং সূর্য্যমুখী তাহাকে দোষী মনে করিলেন। হীরার কথা বলিল।

গভীর রাত্রে গৃহস্থ সকলে নিদ্রিত হইলে কুন্দনন্দিনী শয়নাগারের দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। এক বসনে সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া গেল?

কুন্দ চলিল, চলিল—কেবল চলিল। আকাশে আরও মেঘ জুটিতে লাগিল।

ঝড় উঠিল। প্রথমে শব্দ পরে ধুলি উঠিল, পরে গাছের পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া বায়ু স্বয়ং আসিল। শেষে বৃষ্টি আসিল। কুন্দ কোথায় যাইবে?

বিদ্যুতের আলোকে পথিপার্শ্বে একটা সামান্য গৃহ দেখিল। কুন্দনন্দিনী আসিয়া দ্বারে পিঠ রাখিয়া বসিল। দ্বার পিঠের স্পর্শে শব্দিত হইল। গৃহস্থ মনে করিল, ঝড়; কিন্তু দ্বারে একটা কুকুর থাকে—সেটা ডাকিতে লাগিল। গৃহস্থ আশঙ্কায় দ্বার খুলিয়া দেখিল, আশ্রয়-হীনা স্ত্রীলোক। জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা তুমি?"

কুন্দ কথা কহিল না।

গৃহস্থ বলিল, কে রে মাগী ?

কুন্দ বলিল, "বৃষ্টির জন্য দাঁড়াইয়াছি।"

গৃহস্থ ব্যগ্রভাবে বলিল, "কি ? কি ? আবার বল তো ?"

কুন্দ বলিল, "বৃষ্টির জন্য দাঁড়াইয়াছি।"

গৃহস্থ বলিল— "ও গলা যে চিনি। বটে ? ঘরের ভিতরে এস তো।"

গৃহস্থ কুন্দকে ঘরের ভিতর লইয়া গেল। আগুন করিয়া আলো জ্বালিল। কুন্দ তখন দেখিল,— হীরা।

হীরা বলিল, "বুঝিয়াছি, তিরস্কারে পলাইয়াছ। ভয় নাই। আমি কাহারও সাক্ষাতে বলিব না। আমার এইখানে দুই দিন থাক।"

হীরার বাড়ী প্রাচীর আঁটা ঝর্‌ঝরে্ মেটে ঘর।

হীরার বাড়ী হীরার আয়ী থাকে, আর হীরা। এক ঘরে আয়ী, এক ঘরে হীরা শোয়। হীরা কুন্দকে আপনার কাছে বিছানা করিয়া রাত্রে শুয়াইল। কুন্দ শুইল—ঘুমাইল না। পর দিন তাহাকে সেইখানে রাখিল। বলিল, "আজি কালি দুই দিন থাক ; দেখ, রাগ না পড়ে, পরে যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে যাইও" কুন্দ রহিল। কুন্দের ইচ্ছানুসারে তাহাকে লুকাইয়া রাখিল! ঘরে চাবি দিল, আয়ী না দেখে। পরে বাবুর বাড়ীতে কাজে গেল।

টিক্—টিক্, বাহির দুয়ারের শিকল সাবধানে নড়িল। হীরা বিস্মিত হইল। একজন মাত্র কখনও কখনও রাত্রে শিকল নাড়ে। সে বাবুর বাড়ীর দ্বারোয়ান। হীরা উঠিয়া দেখিতে গেল, দুয়ার খুলিয়া দেখিল চিনিতে পারিল না, পরেই চিনিল— "কে ও গঙ্গাজল ? এ কি ভাগ্য !" হীরার গঙ্গাজল মালতী গোয়ালিনী। মালতী গোয়ালিনীর বাড়ী দেবপুর —দেবেন্দ্র বাবুর বাড়ীর কাছে—বড় রসিকা স্ত্রীলোক। ভাই গঙ্গাজল! অন্তিমকালে যেন তোমায় পাই, কিন্তু এখন কেন ?"

গঙ্গাজল চুপি চুপি বলল, "তোকে দেবেন্দ্রবাবু ডেকেচে।" হাসিয়া বলিল, "তুই কিছু পাবি নাকি ?"

মালতী দুই আঙ্গুলের দ্বারা হীরাকে কহিল, বলিল, "মরণ আর কি! তোর মনের কথা তুই জানিস্। এখন চ!"

হীরা ইহাই চায়। কুন্দকে বলিল, "আমার বাবুর বাড়ী যেতে হলো —ডাকতে এসেছে। কে জানে কেন?" বলিয়া প্রদীপ নিবাইল এবং অন্ধকারে কৌশলে বেশভূষা করিয়া মালতীর সঙ্গে যাত্রা করিল।

দেবেন্দ্রের বৈঠকখানায় হীরা একা গেল। হীরার সঙ্গে আজ অন্যপ্রকার সম্ভাষণ করিলেন, স্তবস্তুতি কিছুই নাই। বলিলেন, 'হীরে সে দিন আমি অধিক মদ খাইয়া তোমার কথার মর্ম্ম কিছুই গ্রহণ করিতে পারি নাই। কেন আসিয়াছিলে, সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছি।"

হী। কেবল আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলাম।

দেবেন্দ্র বলিলেন, "তুমি বড় বুদ্ধিমতী। ভাগ্যক্রমে নগেন্দ্রবাবু তোমার মত দাসী পাইয়াছেন। বুঝিলাম, হরিদাসী বৈষ্ণবীর তত্ত্বে আসিয়াছিলে। আমার মনের কথা জানিতে আসিয়াছিলে, কেন আমি বৈষ্ণবী সাজি, কেন দত্তবাড়ী যাই, এই কথা জানিতে আসিয়াছিলে। তাহা এক প্রকার জানিয়াও গিয়াছ। আমিও তোমার কাছে সে কথা লুকাইব না। তুমি প্রভুর কাজ করিয়া প্রভুর কাছে পুরস্কার পাইয়াছ সন্দেহ নাই। এখন আমার একটি কাজ কর, আমিও পুরস্কার করিব।

দেবেন্দ্র হীরাকে বহু অর্থের লোভ প্রদর্শন করিয়া কুন্দকে বিক্রয় করিতে বলিলেন। শুনিয়া ক্রোধে হীরার চক্ষু রক্তময় হইল—কর্ণরন্ধ্রে অগ্নিবৃষ্টি হইল। হীরা গাত্রোত্থান করিয়া কহিল, "মহাশয়! আমি দাসী বলিয়া এরূপ কথা বলিলেন। ইহার উত্তর আমি দিতে পারিব না। আমার মুনিবকে বলিব। তিনি ইহার উপযুক্ত উত্তর দিবেন।"

প্রাতে উঠিয়া হীরা কাজে গেল। দত্তদের বাড়ীতে দুই দিন পর্য্যন্ত বড় গোল, কুন্দকে পাওয়া যায় না। বাড়ীর সকলেই জানিল যে, সে রাগ করিয়া গিয়াছে, পাড়া প্রতিবাসীরা কেহ জানিল, কেহ জানিল

না। নগেন্দ্র শুনিলেন যে, কুন্দ গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে—কেন গিয়াছে, কেহ তাহা শুনাইল না। নগেন্দ্র ভাবিলেন, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়া কুন্দ আমার গৃহে আর থাকা অনুচিত বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। যদি তাই, তবে কমলের সঙ্গে গেল না কেন? নগেন্দ্রের মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কেহ তাঁহার নিকটে আসিতে সাহস করিল না।

তা ত হলো। কুন্দ বশ হবে! কিন্তু সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের দুই চক্ষের বিষ। তা হলে ত কিছুতেই কিছু হবে না। গোড়ার কাজ সেই হীরা এক্ষণে তাহাদের অভিন্ন হৃদয় ভিন্ন করিবার চেষ্টায় রহিল।

একদিন প্রভাত হইলে পাপী হীরা মনীববাড়ী আসিয়া গৃহকার্যে প্রবৃত্ত হইল। কৌশল্যা নাম্নী আর এক জন পরিচারিকা দত্তগৃহে কাজ করিত। হীরা তাহাকে বলিল, "কুশি দিদি। আজ আমার গা কেমন করিতেছে, তুই আমার কাজগুলো কর্ না?" কৌশল্যা হীরাকে ভয় করিত, অগত্যা স্বীকৃত হইয়া বলিল, "তা করিব বৈ কি? সকলেরই ভাই শরীরের ভাল মন্দ আছে—তা এক মনিবের চাকর—করিব না?"

হীরা। মলো! শরীরের ভাল মন্দ কি লা? আমি কি মরতে বসেছি না কি? আমাকে শরীরের ভালমন্দ দেখাবেন, আবার লোকে বলবে, উনি আশীর্ব্বাদ করলেন। তোর ভালমন্দ হউক।

কৌ। হয় হউক। তা বোন্ রাগ করিস কেন? মরিতে হইবেই একদিন—যম ত আর তোকেও ভুলবে না।

হীরা। তুমি আমার হিংসায় মর। শীগগির নিপাত যাও, তুমি যেন দুটি চক্ষের মাথা খাও।

কৌশল্যা আর সহ্য করিতে পারিল না। তখন কৌশল্যাও আরম্ভ করিল, "তুমি দুটি চক্ষের মাথা খাও। তুমি নিপাত যাও।"

হীরা তখন প্রভুপত্নীর নিকট নালিশ করিতে চলিল; যাইবার সময়

যদি হীরার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত তবে দেখিতে পাইত যে হীরার ক্রোধলক্ষণ কিছু নাই বরং অধর প্রান্তে একটু হাসি আছে।

সূর্য্যমুখী নালিশী আরজী পাইয়া বিহিত বিচার করিলেন। দেখিলেন হীরারই দোষ, তথাপি হীরার অনুরোধে কৌশল্যাকে যৎকিঞ্চিৎ অনুযোগ করিলেন। হীরা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল, "ও মাগীকে ছাড়াইয়া দাও, নইলে আমি থাকিব না।"

তখন সূর্য্যমুখী হীরার উপর বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "হীরে, তোর বড় আদর বাড়িয়াছে! তুই আগে দিলি গা'ল—দোষ সব তোর—আবার তোর কথায় ওকে ছাড়াইব? আমি এমন অন্যায় করিতে পারিব না—তোর যাইতে ইচ্ছা হয় যা, আমি থাকতে বলি না।"

হীরা ইহাই চাই; তখন "আচ্ছা চল্লেম" বলিয়া হীরা চোখের জলে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে বহির্ব্বাটীতে বাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

বাবু বৈঠকখানায় একা ছিলেন। হীরা কাঁদিতেছে দেখিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, "হীরে কাঁদিতেছিস্ কেন?"

হী। আমার মাহিনাপত্র হিসাব করিয়া দিতে হুকুম করুন।

ন। (সবিস্ময়ে) সে কি, কি হয়েছে?

হী। মা ঠাকুরাণী আমাকে জবাব দিয়াছেন।

ন। কি করেছিস্ তুই?

হী। কুশী আমাকে গালি দিয়াছিল—আমি নালিশ করিয়াছিলাম, তিনি তার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমাকে জবাব দিলেন।

নগেন্দ্র মাথা নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সে কাজের কথা নয় হীরে, আসল কথা কি বল্?"

হীরা বলিল, "আসল কথা আমি থাকিব না।"

ন। কেন?

হী। মা ঠাকুরাণীর মুখ বড় এলোমেলো হয়েছে—কারে কখন কি বলেন ঠিক নাই।

নগেন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন—সে কি ?

হীরা যাহা বলিতে আসিয়াছিল, তাহা এইবার বলিল—সে দিন কুন্দঠাকুরাণীকে কি না বলিয়াছিলেন। শুনিয়া কুন্দঠাকুরাণী দেশ-ত্যাগী হয়েছেন। আমাদের ভয়, পাছে আমাদের সেইরূপ কোন দিন কিছু বলেন—আমরা তা হ'লে বাঁচিব না—তাই আগে হইতে সরিতেছি।

ন। সে কি কথা ?

হী। আপনার সাক্ষাতে লজ্জায় তা আমি বলিতে পারি না।

শুনিয়া নগেন্দ্রর ললাট অন্ধকার হইল। তিনি হীরাকে বলিলেন—আজ বাড়ী যা কাল ডাকিব।

হীরার মনস্কাম সিদ্ধ হইল। সে এই জন্য কৌশল্যার সঙ্গে বচসা সৃজন করিয়াছিল।

নগেন্দ্র উঠিয়া সূর্য্যমুখীর নিকটে গেলেন। হীরা পা টিপিয়া টিপিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল।

সূর্য্যমুখীকে নিভৃতে লইয়া গিয়া নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি হীরাকে বিদায় দিয়াছ ? সূর্য্যমুখী বলিলেন—দিয়াছি। অনন্তর হীরা ও কৌশল্যার বৃত্তান্ত সবিশেষ বিবৃত করিলেন। শুনিয়া নগেন্দ্র বলিলেন—করুক ! তুমি কুন্দনন্দিনীকে কি বলিয়াছিলে ?

নগেন্দ্র দেখিলেন সূর্য্যমুখীর মুখ শুকাইল। সূর্য্যমুখী অস্ফুটস্বরে বলিলেন—কি বলিয়াছিলাম ?

ন। কোন দুর্ব্বাক্য ?

সূর্য্যমুখী কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন—তুমি আমার সর্ব্বস্ব ! তোমার কাছে কেন আমি লুকাইব ? কখনও কোন কথা লুকাই নাই, আজ কেন ? আমি কুন্দকে কুকথা বলিয়াছিলাম। অপরাধ মার্জ্জনা করিও। আমি সকল বলিতেছি।

তখন সূর্য্যমুখী হরিদাসী বৈষ্ণবীর পরিচয় হইতে কুন্দনন্দিনীর তিরস্কার পর্য্যন্ত অকপটে সকল বিবৃত করিলেন। বলিয়া শেষে কহিলেন

—আমি কুন্দনন্দিনীকে তাড়াইয়া আপনার মরমে আপনি মরিয়া আছি। দেশে দেশে তাহার তত্ত্বে লোক পাঠাইয়াছি। যদি সন্ধান পাইতাম ফিরাইয়া আনিতাম। আমার অপরাধ লইও না।

নগেন্দ্র তখন বলিলেন—তোমার বিশেষ অপরাধ নাই, তুমি যেরূপ কুন্দের কলঙ্ক শুনিয়াছিলে, তাহাতে কোন্ ভদ্রলোকের স্ত্রী তাকে মিষ্টি কথা বলিবে, কি ঘরে স্থান দিবে? কিন্তু একবার ভাবিলে ভাল হইত যে, কথাটা সত্য কি না?

সূর্য্য। আমার মনের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। কোন কথা এ পাপ মনের ভিতর থাকিতে তোমার কাছে লুকাইব না। আমার অপরাধ লইও না।

নগেন্দ্র বলিলেন—তোমায় বলিতে হইবে না। আমি জানি, তুমি সন্দেহ করিয়াছিলে যে, আমি কুন্দনন্দিনীতে অনুরক্ত।

নগেন্দ্র অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া শেষে বলিলেন—সূর্য্যমুখী। তোমার অপরাধ কিছুই নাই। আমি যথার্থ তোমার নিকট বিশ্বাসহন্তা, যথার্থ ই আমি তোমাকে ভুলিয়া কুন্দনন্দিনীকে—কি বলিব? আমি যে যন্ত্রণা পাইয়াছি, তাহা তোমাকে কি বলিব; আমার চিত্ত বশ হইল না।

যদি কথা পাড়িলে, তবে মনের কথা ব্যক্ত করিয়া বলি—আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। মরিব না—কিন্তু দেশান্তরে যাইব। আমি তোমার অযোগ্য স্বামী। আমি আর কাছে থাকিয়া ক্লেশ দিব না। কুন্দনন্দিনীকে সন্ধান করিয়া আমি দেশদেশান্তরে ফিরিব। তুমি এ গৃহে গৃহিণী থাক। যদি কুন্দনন্দিনীকে ভুলিতে পারি, তবে আবার আসিব। নচেৎ তোমার সঙ্গে এই শেষ সাক্ষাৎ।

সূর্য্য। আর এক মাস গৃহে থাক। ইতিমধ্যে যদি কুন্দনন্দিনীকে না পাওয়া যায়, তবে তুমি দেশত্যাগ করিও। আমি মানা করিব না।

**কুন্দ এখন পিঞ্জরের পাখী—শেষে কুন্দের এমনই দুর্দশা হইল যে**

সে সিদ্ধান্ত করিল, সূর্য্যমুখী দূরীকৃতই করুক, আর যাই করুক, যাওয়াই স্থির।

কিন্তু কি বলিয়া কুন্দ আবার গিয়া সে গৃহ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইবে? একা তো যাইতে বড় লজ্জা করে—তবে হীরা যদি সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়, তা হলে যাওয়া হয়। কিন্তু হীরাকে মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারিল না। এক দিন দুই চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে কুন্দ শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল। হীরা তখন নিদ্রিত। নিঃশব্দে কুন্দ দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বাটীর বাহির হইল। ভাবিল, নগেন্দ্রকে এখন পাইলেও পাইতে পারে।

মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া কুন্দ শেষরাত্রে নগেন্দ্রের গৃহাভিমুখে চলিল। অট্টালিকা সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তখন রাত্রি প্রভাত হইতে কিছু বিলম্ব আছে। কুন্দ পথপানে চাহিয়া দেখিল—নগেন্দ্র কোথাও নাই!

কুন্দনন্দিনী উদ্যান মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া নগেন্দ্রের দীর্ঘায়ত দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইল না, লতামণ্ডপমধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল যে, তাহার প্রস্তর নির্ম্মিত স্নিগ্ধ হর্ম্মোপরি কেহ শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, কুন্দনন্দিনীর বোধ হইল সেই নগেন্দ্র। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সে ধীরে ধীরে বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে লতামণ্ডপস্থ ব্যক্তি গাত্রোত্থান করিয়া বাহির হইল। হতভাগিনী কুন্দ দেখিল যে, সে নগেন্দ্র নহে সূর্য্যমুখী।

কুন্দ তখন ভীতা হইয়া এক প্রস্ফুটিতা কামিনীর অন্তরালে দাঁড়াইল। ভয়ে অগ্রসর হইতে পারিল না, পশ্চাদপসৃতও হইতে পারিল না। দেখিতে লাগিল, সূর্য্যমুখী উদ্যানমধ্যে পুষ্পচয়ন করিতে করিতে যেখানে কুন্দ লুকাইয়া আছে, সূর্য্যমুখী ক্রমে সেই দিকে আসিতে লাগিলেন। কুন্দ দেখিল যে, ধরা পড়িলাম। শেষে সূর্য্যমুখী কুন্দকে দেখিতে পাইলেন। দূর হইতে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে গা?"

কুন্দ ভয়ে নীরব হইয়া রহিল—পা পড়িল না। সূর্য্যমুখী তখন

নিকটে আসিলেন—দেখিলেন—চিনিলেন সে কুন্দ। বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "কে, কুন্দ না কি !"

কুন্দ তখন উত্তর করিতে পারিল না। সূর্য্যমুখী কুন্দের হাত ধরিলেন, বলিলেন, "কুন্দ ! এসো—দিদি এসো। আর আমি তোমায় কিছু বলব না।"

এই বলিয়া সূর্য্যমুখী হস্ত ধরিয়া কুন্দনন্দিনীকে অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া গেলেন।

সেই দিন রাত্রে দেবেন্দ্র দত্ত একাকী ছদ্মবেশে, সুরারঞ্জিত হইয়া কুন্দনন্দিনীর অনুসন্ধানে হীরার বাড়ীতে দর্শন দিলেন, এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিয়া দেখিলেন কুন্দ নাই ! হীরা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। দেবেন্দ্র রুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসিস্ কেন ?"

হীরা বলিল, তোমার দুঃখ দেখে ! পিঁজরার পাখী পলাইয়াছে আমার বাড়ী খানাতল্লাসী করিলে পাইবে না।"

দেবেন্দ্র পকেট হইতে একটি ব্রাণ্ডি ফ্লাস্ক বাহির করিয়া বিনা জলে পান করিলেন এবং রাগযুক্ত হইলেন, বলিলেন, হীরার চক্ষু বড় সুন্দর।

দেবেন্দ্র হীরাকে বলিলেন, "তোমার দিব্য চক্ষু !" হীরা মৃদু হাসিল। হীরার চক্ষু আরও জ্বলিতে লাগিল। ক্ষণকালের জন্য হীরার আত্মবিস্মৃতি জন্মিল। সে যে হীরা, এই যে দেবেন্দ্র, তাহা ভুলিয়া গেল। মনে করিতেছিল ইনি স্বামী—আমি পত্নী !

এ কথা ব্যক্ত হইবার পর হীরার চৈতন্য হইল, মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। তখন সে উন্মত্তের ন্যায় কহিলেন, "আপনি শীঘ্র আমার ঘর হইতে যান।"

দে। সে কি ? তাড়াইয়া দিতেছ কেন ?

হীরা। আপনি যান—নহিলে লোক ডাকিব—আপনি কেন আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছিলেন ?

হীরা তখন উন্মাদিনীর ন্যায় বিবশা।

বেলা দুই প্রহর। শ্রীশবাবু অফিসে বাহির হইয়াছেন, বাটীর লোকজন সব আহারান্তে নিদ্রা যাইতেছে। কোথায় কেহ নাই, এই সময়ে এক জন দ্বারী ঘুম চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া একখানি পত্র আনিয়া কমলের হাতে দিল। কমল দেখিলেন সূর্য্যমুখীর পত্র। খুলিয়া পড়িলেন। পড়িয়া আবার পড়িলেন। আবার পড়িয়া বিষণ্ণ মনে মৌনী হইয়া বসিলেন। পত্র এইরূপ—

"প্রিয়তমে। তুমি কলকাতায় গিয়া পর্য্যন্ত আমাদের ভুলিয়া গিয়াছ—নহিলে এখনও পত্র লিখিলে না কেন? তোমার সংবাদের জন্য আমি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকি, জান না?

"তুমি কুন্দনন্দিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহাকে পাওয়া গিয়াছে—শুনিয়া সুখী হইবে। তাহা ছাড়া আরও একটা খোস্‌খবর আছে—কুন্দের সঙ্গে আমার স্বামীর বিবাহ হইবে—এ বিবাহে আমি ঘটক। বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রে আছে—তবে দোষ কি? দুই এক দিনের মধ্যে বিবাহ হইবে। তুমি আসিয়া জুটিতে পারিবে না—নচেৎ তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতাম। পার যদি, তবে ফুলশয্যায় সকলে আসিও।

কমলমণি পত্রের কিছুই অর্থ বুঝিতে পারিলেন না।

কমলমণি বলিলেন,—যাহা হোক, আমাদিগের গোবিন্দপুর যাইতে হইবে।

শ্রীশ। তুমি বিবাহ বন্ধ করিতে পারিবে?

কমল। না পারি, দাদার সম্মুখে মরিব।

শ্রীশ। তা পারিবে না। তবে নূতন ভাইজের নাক কাটিয়া আনিতে পারিবে। চল সেই উদ্দেশ্যে যাই।

পরদিন প্রাতে তাঁহারা নৌকারোহণে গোবিন্দপুর যাত্রা করিলেন। যথাকালে তথায় উপস্থিত হইলেন।

অতি ব্যস্তে মণি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া স্পষ্ট স্বরে সাহসশূন্য হইয়া দাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সূর্য্যমুখী কোথায়?"

দাসীরা বলিয়া দিল, সূর্য্যমুখী শয়নগৃহে আছেন। কমলমণি ছুটিলেন—শয়নগৃহে গেলেন।

প্রবেশ করিয়া প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। মুহূর্ত্তকাল ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিলেন; শেষে দেখিতে পাইলেন, ঘরের কোণে এক রুদ্ধ গবাক্ষসন্নিধানে অধোবদনে একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। কমলমণি তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু চিনিলেন যে, সূর্য্যমুখী। পরে সূর্য্যমুখী তাহার পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া উঠিয়া কাছে আসিলেন।

কমলমণি বুঝিলেন যে, বিবাহ হইয়া গিয়াছে;—জিজ্ঞাসা করিলেন "কবে হলো?" সূর্য্যমুখী সেইরূপ মৃদুস্বরে বলিলেন, "কাল"। সূর্য্যমুখী কমলের কোলে মাথা লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

যখন প্রদোষে উভয়ে উভয়ের নিকট স্পষ্ট করিয়া কথা কহিতে সমর্থ হইলেন, তখন সূর্য্যমুখী কমলমণির কাছে নগেন্দ্র ও কুন্দনন্দিনীর বিবাহ বৃত্তান্তের আমূল পরিচয় দিলেন। শুনিয়া কমলমণি বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "এ বিবাহ তোমার যত্নেই হইয়াছে—কেন তুমি আপনার মৃত্যু উদ্যোগ আপনি করিলে?"

সূর্য্য। আবার আমার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? আমি কে?

কমল তখন স্বচ্ছন্দচিত্তে শয়নমন্দিরে গেলেন। প্রাতে সূর্য্যমুখীর সন্ধানে তাঁহার শয্যাগৃহে গিয়া দেখিলেন, সূর্য্যমুখী তথায় নাই, কিন্তু অত্যুক্ত শয্যার উপরে একখানি পত্র পড়িয়া আছে। পত্র দেখিয়াই কমলমণির মাথা ঘুরিয়া গেল—পত্র পড়িতে হইল না—না পড়িয়াই সকল বুঝিলেন সূর্য্যমুখী পলায়ন করিয়াছে। কপালে করাঘাত করিয়া শয্যায় বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "আমি পাগল। নচেৎ কাল ঘরে যাইবার সময় বুঝিয়াও বুঝিলাম না কেন? সতীশ নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল। মার কপালে করাঘাত ও রোদন দেখিয়া সেও কাঁদিতে লাগিল।"

শোকের প্রথম বেগ সংবরণ হইলে কমলমণি পত্র খুলিয়া পড়িলেন। পত্রখানির শিরোনামায় তাঁহারই নাম।* পত্র এইরূপ—

'যে দিন স্বামীর মুখে শুনিলাম যে আমাতে আর তাঁর কিছুমাত্র সুখ নাই, তিনি কুন্দনন্দিনীর জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইবেন, অথবা প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই দিনই মনে সঙ্কল্প করিলাম, যদি কুন্দনন্দিনীকে আবার কখনও পাই, তবে তাহার হাতে স্বামীকে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিব। কুন্দনন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া যাইব; কেন না, আমার স্বামী কুন্দনন্দিনীর হইলেন, ইহা চক্ষে দেখিতে পারিব না, এখনি কুন্দ-নন্দিনীকে পুনর্ব্বার পাইয়া তাহাকে স্বামী দান করিলাম। আপনিও গৃহত্যাগ করিয়া চলিলাম।

কাল বিবাহ হইবার পরেই আমি রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতাম; কিন্তু স্বামীর যে সুখের কামনায় আপনার প্রাণ আপনিই বধ করিলাম, সে সুখ দুই একদিন চক্ষে দেখিয়া যাইবার সাধ ছিল। আর তোমাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম—তুমি অবশ্য আসিবে, জানিতাম। এখন উভয় সাধ পরিপূর্ণ হইয়াছে। আবার যিনি প্রাণাধিক, তিনি সুখী হইয়াছেন ইহা দেখিয়াছি! তোমার নিকট বিদায় লইয়াছি। আমি এখন চলিলাম।

"তুমি যখন এই পত্র পাইবে, তখন আমি অনেক দূর যাইব।"

জন্মের মত স্বামীর কাছে বিদায় লইলাম, ইহাতে জানিতে পারিবে যে, আমি কত দুঃখে সর্ব্বত্যাগিনী হইতেছি।

"তোমার কাছে জন্মের মত বিদায় লইলাম—আশীর্ব্বাদ করি তোমার স্বামী পুত্র দীর্ঘজীবী হউক, তুমি চিরসুখী হও, আরও আশীর্ব্বাদ করি যে, যে দিন তুমি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে সেই দিন যেন তোমার আয়ু শেষ হয়। আমায় এ আশীর্ব্বাদ কেহ করে নাই!"

বলা বাহুল্য যে, যখন সূর্য্যমুখীর পলায়নের সংবাদ গৃহমধ্যে রাষ্ট্র

হইল, তখন তাঁহার অন্বেষণে লোক পাঠাইবার বড় তাড়াহুড়ো পড়িয়া গেল। নগেন্দ্র চারিদিকে লোক পাঠাইলেন।

প্রথমে শ্রীশচন্দ্র, নগেন্দ্র এবং কমলকে ভরসা দিতে লাগিলেন, "তিনি কখনও পথ হাঁটেন নাই—কতদূর যাইবেন? এক পোওয়া আধ ক্রোশ পথ গিয়া কোথায় বসিয়া আছেন, এখনই সন্ধান পাইব।" কিন্তু যখন তিন ঘণ্টা অতীত হইল, অথচ সূর্য্যমুখীর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, তখন নগেন্দ্র স্বয়ং তাঁহার সন্ধানে বাহির হইলেন। কিছুক্ষণ রৌদ্রে পুড়িয়া ঘুরিয়া মনে করিলেন, "আমি খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু হয়ত সূর্য্যমুখীকে এতক্ষণ বাড়ী আনিয়াছে।" এই বলিয়া ফিরিলেন। বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, সূর্য্যমুখীর কোন সংবাদ নাই। আবার বাহির হইলেন। আবার বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে দিনমান গেল।

( হরদেব ঘোষালের প্রতি নগেন্দ্র দত্তের পত্র )

"তুমি লিখিয়াছ যে, আমি এ পৃথিবীতে যত কাজ করিয়াছি, তাহার মধ্যে কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করা সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রান্তিমূলক কাজ, ইহা আমি করিয়াছি।"

আমি কেন কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়াছিলাম? আমি কি তাহাকে ভালবাসিতাম? ভালবাসিতাম বৈ কি—তাহার জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইতে বসিয়াছিলাম—প্রাণ বাহির হইতেছিল। কিন্তু এখন বুঝিতেছি সে কেবল চোখের ভালবাসা। নহিলে আজি পনের দিবসমাত্র বিবাহ করিয়াছি—এখনই বলিব কেন, "আমি কি তাহাকে ভালবাসিতাম?" ভালবাসিতাম কেন? এখনও ভালবাসি—কিন্তু আমার সূর্য্যমুখী কোথায় গেল? অনেক কথা লিখিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আজ আর পারিলাম না। বড় কষ্ট হইতেছে। ইতি।"

( হরদেব ঘোষালের উত্তর )

"আমি তোমার মন বুঝিয়াছি, কুন্দনন্দিনীকে ভালবাসিতে না,

এমত নহে—এখনও ভালবাস, কিন্তু সে যে চোখের ভালবাসা ইহা যথার্থ বলিয়াছ। সূর্য্যমুখীর প্রতি তোমার গাঢ় স্নেহ—কেবল দুই দিনের জন্য কুন্দনন্দিনীর মায়ায় তাহা আবৃত হইয়াছিল। এখন সূর্য্যমুখীকে হারাইয়া তাহা বুঝিয়াছি।

অতএব তোমাকে তিরস্কার করিব না। বরং পরামর্শ দিই, ইহাতে সুখী হইবার চেষ্টা কর।

তুমি নিরাশ হইও না। সূর্য্যমুখী অবশ্য পুনরাগমন করিবেন—তোমাকে না দেখিয়া তিনি কত কাল থাকিবেন? যত দিন না আসেন, তুমি কুন্দনন্দিনীকে স্নেহ করিও। তোমার পত্রাদিতে যত বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হইয়াছে, তিনিও গুণহীনা নহেন। রূপজ মোহ দূর হইলে কালে স্থায়ী প্রেমের সঞ্চার হইবে। তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়াই সুখী হইতে পারিবে এবং যদি তোমার জ্যেষ্ঠা ভার্য্যার সাক্ষাৎ আর না পাও, তাহাকে ভুলিতে পারিবে। বিশেষ কনিষ্ঠা তোমাকে ভালবাসেন। ভালবাসার কখনই অযত্ন করিও না। করিবে না। কেন না, ভালবাসাতেই মানুষের একমাত্র নির্ম্মল এবং অবিনশ্বর সুখ। ভালবাসাই মনুষ্যজাতির উন্নতির শেষ উপায়—মনুষ্যমাত্রে পরস্পরে ভালবাসিলে আর মনুষ্যকৃত অনিষ্ট পৃথিবীতে থাকিবে না।”

নগেন্দ্র যখন কুন্দনন্দিনীকে গোবিন্দপুরে রাখিয়া পর্যটনে যাত্রা করিলেন, তখন হীরা পূর্ব্ব আনুগত্যের বলে দাসীত্ব ভিক্ষা করিল। কুন্দের অভিপ্রায় জানিয়া নগেন্দ্র হীরাকে কুন্দনন্দিনীর পরিচর্যায় নিযুক্ত রাখিয়া গেলেন।

একদিন নগেন্দ্র বিদেশ যাত্রা করিলে পর, হীরা একাকিনী অন্তঃপুরসন্নিহিত পুষ্পোদ্যানে লতামণ্ডপে শয়ন করিয়াছিল। নগেন্দ্রও সূর্য্যমুখীকে পরিত্যাগ করা অবধি সে সকল লতামণ্ডপ হীরারই অধিকারগত হইয়াছিল। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। এমন সময় হীরা অকস্মাৎ লতামণ্ডপমধ্যে পুরুষমূর্তি দেখিতে পাইল। চাহিয়া

যাহাকে দেখিল সে আর অন্য কেহ নহে দেবেন্দ্র। অদ্য দেবেন্দ্র ছদ্মবেশী নহেন নিজ বেশেই আসিয়াছেন।

হীরা বিস্মিত হইয়া কহিল, "আপনার এ অতি দুঃসাহস। কেহ দেখিতে পাইলে আপনি মারা পড়িবেন।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "যেখানে হীরা আছে, সেখানে আমার ভয় কি?" এই বলিয়া দেবেন্দ্র হীরার পার্শ্বে বসিলেন। হীরা চরিতার্থ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিল, "কেন এখানে এসেছেন? যার আশায় এসেছেন, তার দেখা পাইবেন না।"

"তা তো পাইয়াছি। আমি তোমারই আশায় এসেছি।"

হীরা লুব্ধ চাটুকারের কপটালাপে প্রতারিত না হইয়া হাসিল এবং কহিল, 'আমার কপাল যে এত প্রসন্ন হইয়াছে, তা ত জানি না। যাহা হউক, যদি আমার ভাগ্যই ফিরিয়াছে, তবে যেখানে নিষ্কণ্টকে বসিয়া আপনাকে দেখিয়া মনের তৃপ্তি হইবে এমন স্থানে যাই চলুন।"

দেবেন্দ্র কহিলেন, "তবে চল; তোমার নূতন গৃহিণীর সঙ্গে আলাপটা একবার চালিয়ে গেলে হয় না?"

হীরা কহিল, "এইখানে আপনি সতর্ক হইয়া বসিয়া থাকুন, আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতেছি।"

এই বলিয়া লতামণ্ডপ হইতে বাহিরে গিয়া দ্বাররক্ষকদিগকে বলিল, "তোমরা শীঘ্র আইস, ফুলবাগানে চোর আসিয়াছে।"

তখন দোবে, চোবে, পাঁড়ে এবং তেওয়ারি পাকা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া অন্তঃপুরমধ্যে দিয়া ফুলবাগানের দিকে ছুটিল। দেবেন্দ্র দূর হইতে তাহাদের কালো গালপাট্টা দেখিতে পাইয়া, লতা-মণ্ডপ হইতে লাফ দিয়া বেগে পলায়ন করিল। তেওয়ারি-গোষ্ঠী কিছুদূর পশ্চাদ্ধাবিত হইল। তাঁহারা দেবেন্দ্রকে ধরিতে পারিয়াও ধরিল না। কিন্তু দেবেন্দ্র কিঞ্চিৎ পুরস্কৃত না হইয়া গেলেন না।

দেবেন্দ্র গৃহে গিয়া দুই বিষয়ে স্থিরসংকল্প হইলেন। প্রথম হীরা

থাকিতে তিনি আর দত্তবাড়ী যাইবেন না। দ্বিতীয়, হীরাকে ইহার প্রতিফল দিবেন। পরিণামে তিনি হীরাকে গুরুতর প্রতিফল প্রদান করিলেন। হীরা এমন গুরুতর শাস্তি প্রাপ্ত হইল যে, তাহা দেখিয়া শেষে দেবেন্দ্ররও পাষাণহৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল। তাহা বিস্তারে বর্ণনায় নহে, পরে সংক্ষেপে বলিব।

বর্ষাকাল। বড় দুর্দিন। সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে। একবারে সূর্য্যোদয় হয় নাই। আকাশ মেঘে ঢাকা। কাশী যাইবার পাকা রাস্তাও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছে। পথে প্রায় লোক নাই—ভিজিয়া কে পথ চলে ? একজন মাত্র পথিক পথ চলিতেছিল। পথিকের ব্রহ্মচারী বেশ।

"মা গো।"

অন্ধকারে যাইতে যাইতে ব্রহ্মচারী অকস্মাৎ পথিমধ্যে এই শব্দসূচক দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনিতে পাইলেন। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল। বিদ্যুৎ চমকাইলে পথিক দেখিলেন, পথিপার্শ্বে কি একটা পড়িয়া আছে। এটা কি মনুষ্য ? পথিক তাহাই বিবেচনা করিলেন। তখন পথিক ডাকিয়া বলিলেন, 'কে তুমি পথে পড়িয়া আছো ?'

কেহ কোন উত্তর দিল না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—এবার অস্ফুট কাতরোক্তি। তখন ব্রহ্মচারী ছত্র তৈজস ভূতলে রাখিয়া সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ হস্তপ্রসারণ করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ কোমল মনুষ্যদেহে করস্পর্শ হইল, "কে গা তুমি ?" শিরোদেশে হাত দিয়া কবরী স্পর্শ করিলেন, "দুর্গে! এ যে স্ত্রীলোক।"

তখন ব্রহ্মচারী উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া অচেতন স্ত্রীলোকটিকে দুই হস্ত দ্বারা কোলে তুলিলেন। ব্রহ্মচারী পথ ত্যাগ করিয়া সেই অন্ধকারে মাঠ ভাঙ্গিয়া গ্রাম্যাভিমুখে চলিলেন। ব্রহ্মচারী এ প্রদেশের পথ ঘাট গ্রাম বিলক্ষণ জানিতেন। শরীর বলিষ্ঠ নহে, তথাপি শিশু-সন্তানবৎ সেই মরণোন্মুখীকে কোলে করিয়া এই দুর্গম পথ ভাঙিয়া চলিলেন।

গ্রামের প্রান্তভাগে ব্রহ্মচারী এক পর্ণকুটীর প্রাপ্ত হইলেন। নিঃসংজ্ঞা স্ত্রীলোককে ক্রোড়ে লইয়া সেই কুটীরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ডাকিলেন, "বাছা হর ঘরে আছ গা ?" কুটীরমধ্য হইতে একজন স্ত্রীলোক কহিল, "এ যে ঠাকুরের গলা শুনতে পাই। ঠাকুর কবে এলেন।

ব্রহ্মচারী। এই আস্‌ছি। শীঘ্র দ্বার খোল—আমি বড় বিপদ-গ্রস্ত।

হরমণি কুটীরের দ্বার মোচন করিল। ব্রহ্মচারী তখন তাহাকে প্রদীপ জ্বালিতে বলিয়া আস্তে আস্তে স্ত্রীলোকটিকে গৃহমধ্যে মাটির উপর শোয়াইলেন। হরমণি প্রদীপ জ্বালিয়া তাহা মুমূর্ষুর মুখের কাছে আনিয়া উভয়ে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া দেখিলেন।

ব্রহ্মচারী সবিশেষ পরিচয় দিয়া বলিলেন, "ইহার মৃত্যু নিকট দেখিতেছি। কিন্তু তাপ-সেক করিলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। আমি যেমন বলি, তাই করিয়া দেখ।"

তখন হরমণি ব্রহ্মচারীর আদেশমত, তাহাকে আর্দ্রবস্ত্রের পরিবর্তে আপনার একখানি শুষ্ক বস্ত্র পরাইল। শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা তাহার অঙ্গের এবং কেশের জল মুছাইল। পরে অগ্নি প্রস্তুত করিয়া তাপ দিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী বলিলেন—বোধ হয়, অনেকক্ষণ অবধি অনাহারে আছে। যদি ঘরে দুধ থাকে, একে একটু একটু করিয়া দুধ খাওয়াইবার চেষ্টা কর।

হরমণির গোরু ছিল—ঘরে দুধও ছিল। দুধ তপ্ত করিয়া অল্প অল্প করিয়া স্ত্রীলোটিকে পান করাইতে লাগিল। স্ত্রীলোক তাহা পান করিল। উদরে দুগ্ধ প্রবেশ করিলে, সে চক্ষু উন্মীলিত করিল। দেখিয়া হরমণি জিজ্ঞাসা করিল—মা তুমি কোথা থেকে আসিতেছিলে গা ?

সংজ্ঞালব্ধ স্ত্রীলোক কহিল—আমি কোথায় ? ব্রহ্মচারী কহিলেন—তোমাকে পথে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়া এখানে আনিয়াছি। তুমি কোথা যাইবে ?

স্ত্রীলোক বলিল অনেক দূর।

সূর্য্যমুখীর বাঁচিবার আশা ছিল না। ব্রহ্মচারী তাঁহার পীড়ার লক্ষণ বুঝিতে না পারিয়া পরদিন প্রাতে গ্রামস্থ বৈদ্যকে ডাকাইলেন।

রামকৃষ্ণ রায় বড় বিজ্ঞ। বৈদ্যশাস্ত্রে বড় পণ্ডিত। চিকিৎসাতে গ্রামে তাঁহার বিশেষ যশঃ ছিল। তিনি পীড়ার লক্ষণ দেখিয়া বলিলেন—ইহা কাস রোগ। তার উপর জ্বর হইতেছে পীড়া সাঙ্ঘাতিক বটে। তবে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে।

সূর্য্যমুখী বলিলেন—ঠাকুর! আপনি আমার জন্য এত যত্ন করিতেছেন কেন? আমার জন্য ক্লেশের প্রয়োজন নেই!

ব্রহ্মচারীও চক্ষু মুছিলেন। বলিলেন—তোমার স্বামী কোথায়? এখন তোমাকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইবার উপায় নাই। কিন্তু তিনি যদি সংবাদ দিলে এখানে আসিতে পারেন, তবে আমি তাঁহাকে পত্রের দ্বারা সংবাদ দিই।

সূর্য্যমুখীর রোগাক্লিষ্ট মুখে হর্ষবিকার হইল। ভগ্নোৎসাহ হইয়া কহিলেন, তিনি আসিলে আসিতে পারেন, কিন্তু আসিবেন কি না জানি না। কিন্তু তিনি অনেক দূরে আছেন—আমি ততদিন বাঁচিব কি?

ব্রহ্ম। বাঁচিবে।

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী কাগজ কলম লইয়া আসিলেন এবং সূর্য্যমুখীর কথামত পত্র লিখিলেন:—

পত্র লিখিয়া ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার নামে শিরোনামা দিব।

সূর্য্যমুখী বলিলেন—হরমণি আসিলে বলিব।

হরমণি আসিলে নগেন্দ্র দত্তের নামে শিরোনামা দিয়া ব্রহ্মচারী নিকটস্থ ডাকঘরে দিতে গেলেন।

কিন্তু এ পত্র ত নগেন্দ্রের নিকট পৌঁছিল না। পত্র যখন গোবিন্দ-

পুরে পৌছিল, তাহার অনেক পূর্ব্বে নগেন্দ্র দেশ পর্যটনে যাত্রা করিয়াছিলেন। হরকরা পত্র বাড়ীর দেওয়ানের কাছে দিয়া গেল।

দেওয়ানের প্রতি নগেন্দ্রের আদেশ ছিল যে—আমি যখন যেখানে পৌঁছিব, তখন সেইখান হইতে পত্র লিখিব। আমার আজ্ঞা পাইলে সেইখানে, আমার নামের পত্রগুলি পাঠাইয়া দিবে।

যথাসময়ে নগেন্দ্র কাশীধামে আসিলেন। আসিয়া দেওয়ানকে সংবাদ দিলেন। তখন দেওয়ান অন্যান্য পত্রের সঙ্গে শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর পত্রও পাঠালেন। নগেন্দ্র পত্র পাইয়া মর্মাবগত হইয়া অঙ্গুলিদ্বারা কপাল টিপিয়া ধরিয়া কাতরে কহিলেন,—জগদীশ্বর! মুহূর্তজন্য আমার চেতনা রাখ। জগদীশ্বরের চরণে সে বাক্য পৌঁছিল, মুহূর্তজন্য নগেন্দ্রের চেতনা রহিল; কর্মাধ্যক্ষকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন—আজ রাত্রেই আমি রাণীগঞ্জ যাত্রা করিব—সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও তুমি তাহার বন্দোবস্ত কর।

কর্মাধ্যক্ষ ব্যবস্থা করিতে গেল। নগেন্দ্র তখন ভূতলে ধূলির উপর শয়ন করিয়া, অবচেতন হইলেন।

সেই রাত্রে নগেন্দ্র কাশী পশ্চাৎ করিলেন। নগেন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, শিবপ্রসাদের পত্র অনেক দিনের পর পৌঁছিয়াছে—এখন সূর্য্যমুখী কোথায়?

বর্ষা গেল। শরৎকালও যায়। এমন সময় কার্ত্তিক মাসের একদিন প্রাতঃকালে মধুপুরের রাস্তার উপরে একখানি পাল্কী আসিল। পল্লীগ্রামে পাল্কী দেখিয়া দেশের ছেলে মেয়ে খেলা ফেলিয়া পাল্কীর ধারে কাতার দিয়া দাঁড়াইল।

পাল্কীর ভিতর হইতে নগেন্দ্রনাথ বাহির হইলেন। নগেন্দ্রনাথ তখন একজন বিশিষ্ট লোকের বাড়ীতে গেলেন। সে গৃহের গৃহস্বামী রামকৃষ্ণ রায় কবিরাজ। রামকৃষ্ণ রায় একজন বাবু আসিয়াছেন দেখিয়া যত্ন করিয়া একখানি চেয়ারের উপর নগেন্দ্রকে বসাইলেন। নগেন্দ্র

ব্রহ্মচারীর সংবাদ তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। রামকৃষ্ণ রায় বলিলেন,—ব্রহ্মচারী ঠাকুর এখানে নাই। নগেন্দ্র বড় বিষণ্ণ হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি কোথায় গিয়াছেন ?

উত্তর। তাহা বলিয়া যান নাই। কোথায় গিয়াছেন তাহা আমরা জানি না। ‘বিশেষ’ তিনি একস্থানে স্থায়ী নহেন, সর্বদা নানা স্থানে পর্যটন করিয়া বেড়ান।

ন। ভাল এ গ্রামে হরমণি বৈষ্ণবীর বাড়ী কোথায় ?

রামকৃষ্ণ। হরমণির ঘর পথের ধারেই ছিল। কিন্তু এখন আর তার সে ঘর নাই। সে ঘর আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে।

ক্ষীণতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—হরমণি কোথায় আছে।

রামকৃষ্ণ। তাহাও কেহই বলিতে পারে না। যে রাত্রে তাহার ঘরে আগুন লাগে, সেই অবধি সে কোথাও পালাইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ এমনও বলে যে, সে আপনার ঘরে আপনি আগুন দিয়া পলাইয়াছে।

নগেন্দ্র ভগ্নস্বর হইয়া কহিলেন, “তাহার ঘরে কোন স্ত্রীলোক থাকিত ?”

রামকৃষ্ণ রায় কহিলেন, না, কেবল শ্রাবণ মাস হইতে একটি বিদেশী স্ত্রীলোক পীড়িতা হইয়া আসিয়া তাহার বাড়ীতে ছিল। সেটিকে ব্রহ্মচারী কোথা হইতে আনিয়া তাহার বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, তাহার নাম সূর্য্যমুখী। স্ত্রীলোকটি কাসরোগগ্রস্ত ছিল,—আমিই তাহার চিকিৎসা করি। প্রায় আরোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলাম এমন সময়ে—”

নগেন্দ্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এমন সময়ে কি—?” রামকৃষ্ণ বলিলেন, “এমন সময়ে হরবৈষ্ণবীর গৃহদাহে ঐ স্ত্রীলোকটি পুড়িয়া মরিল।”

নগেন্দ্রনাথ চৌকী হইতে পড়িয়া গেলেন। মস্তকে দারুণ আঘাত পাইলেন। সেই আঘাতে মূর্ছিত হইলেন, কবিরাজ তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

বাঁচিতে কে চাহে? এ সংসার বিষময়। বিষবৃক্ষ সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গণে। কে ভালবাসিতে চাহে?

এতদিনে সব ফুরাইল। সন্ধ্যাকালে যখন নগেন্দ্র দত্ত মধুপুর হইতে পাল্কীতে উঠিলেন, তখন এই কথাই মনে মনে বলিলেন, আমার এত দিনে সব ফুরাইল।"

হঠাৎ তাঁহার স্মরণ হইল যে, তিনি সুখে শিবিকারোহণে-যাইতেছেন; সূর্য্যমুখী পথ হাঁটিয়া পীড়িতা হইয়াছিলেন। অমনি নগেন্দ্র শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে চলিলেন। বাহকেরা শূন্য শিবিকা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আনিতে লাগিল। প্রাতে যে বাজারে আসিলেন, সেখানে শিবিকা ত্যাগ করিয়া বাহকদিগকে বিদায় দিলেন। অবশিষ্ট পথ পদব্রজে অতিবাহিত করিলেন।

রাত্রি প্রহরেকের সময় শ্রীশচন্দ্র একাকী বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে—পদব্রজে নগেন্দ্র সেইখানে উপস্থিত হইয়া স্বহস্তবাহিত কানভাস ব্যাগ দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ব্যাগ রাখিয়া নীরবে একখানা চেয়ারের উপর বসিলেন।

শ্রীশচন্দ্র তাঁহার ক্লিষ্ট-মলিন মুখকান্তি দেখিয়া ভীত হইলেন এবং তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—ভাই নগেন্দ্র, তোমাকে নীরব দেখিয়া আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছি! তুমি মধুপুর যাও নাই?"

"গিয়াছিলাম।"

শ্রীশচন্দ্র ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সূর্য্যমুখীর কোন সংবাদ পাইলে? কোথায় তিনি?"

নগেন্দ্র ঊর্দ্ধে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "স্বর্গে।"

কমল শুনিলেন, সূর্য্যমুখী নাই।

শ্রীশচন্দ্র কিঞ্চিৎ খাদ্য লইয়া নগেন্দ্রের সম্মুখে রাখিলেন। নগেন্দ্র

বলিলেন, "উহার আবশ্যক নাই—কিন্তু তুমি বসো। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে—তাহা বলিতেই এখানে আসিয়াছি।"

তখন নগেন্দ্র, রামকৃষ্ণ রায়ের কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, সকলই শ্রীশচন্দ্রের নিকট বিবৃত করিলেন। তাহার পর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহা যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা সকলই বলিলেন।

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "ব্রহ্মচারীর সঙ্গে পথে তোমার সাক্ষাৎ হয় নাই, ইহা আশ্চর্য! কেন না, গতকল্য কলিকাতা হইতে তোমার সন্ধানে তিনি মধুপুর যাত্রা করিয়াছেন।"

নগেন্দ্র। সে কি? তুমি ব্রহ্মচারীর সন্ধান কি প্রকারে পাইলে?

শ্রীশ। তিনি অতি মহৎ ব্যক্তি। তোমার পত্রের উত্তর না পাইয়া তিনি তোমার সন্ধান করিতে স্বয়ং গোবিন্দপুরে গিয়াও তোমায় পাইলেন না; কিন্তু শুনিলেন যে, তাঁহার পত্র কাশীতে প্রেরিত হইবে। সেখানে তুমি পত্র পাইবে। অতএব আর ব্যস্ত না হইয়া এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি পুরুষোত্তম যাত্রা করেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তোমার সন্ধানার্থ পুনশ্চ গোবিন্দপুর গিয়াছিলেন। সেখানে তোমার কোন সংবাদ পাইলেন না—শুনিলেন, আমার কাছে তোমার সংবাদ পাইবেন। আমার কাছে আসিলেন। পরশ্ব আমার কাছে আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে তোমার পত্র দেখাইলাম। তিনি তখন মধুপুরে তোমার সাক্ষাৎ পাইবার ভরসায় কালই গিয়াছেন। কাল রাত্রে রাণীগঞ্জে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা ছিল।

নগেন্দ্র। আমি কাল রাণীগঞ্জে ছিলাম না।

তখন শ্রীশচন্দ্র ব্রহ্মচারীর নিকট শ্রুত তাঁহার সহিত সূর্য্যমুখীর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা, পীড়ার কথা এবং চিকিৎসা ও অপেক্ষাকৃত আরোগ্যলাভের কথা বলিলেন। অনেক বাদ দিয়া বলিলেন—সূর্য্যমুখী কত দুঃখ পাইয়াছিলেন, সে সকল বলিলেন না।

শ্রীশচন্দ্র নীরব হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, "ভাই, বৃথা কেন

আর সে কথা ভাব ? তোমার দোষ কিছুই নাই। তুমি তাঁর অমতে বা অবাধ্য হইয়া কিছুই কর নাই। যাহা আত্মদোষে ঘটে নাই, তার জন্য অনুতাপ বুদ্ধিমানে করে না।"

হীরা মহারত্ন কর্পদ্দকের বিনিময়ে বিক্রয় করিল। ধর্ম চিরকষ্টে রক্ষিত হয়, কিন্তু একদিনের অসাবধানতায় বিনষ্ট হয়। হীরার তাই হইল। ধনের লোভে হীরা এই মহারত্ন বিক্রয় করিল।

যখন দেখা সাক্ষাতেও শেষ দিনে হীরা দেবেন্দ্রের চরণাবলুণ্ঠিতা হইয়া বলিয়াছিল যে "দাসীরে পরিত্যাগ করিও না," তখন দেবেন্দ্র তাহাকে বলিয়াছিলেন আমি কেবল কুন্দনন্দিনীর লোভে তোমাকে এতদূর সম্মানিত করিয়াছিলাম—যদি কুন্দের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করাইতে পার, তবেই তোমার সঙ্গে আমার আলাপ থাকিবে—নচেৎ এই পর্য্যন্ত। তুমি যেমন গর্বিতা, তেমনি আমি তোমাকে প্রতিফল দিলাম ; এখন তুমি এই কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া গৃহে যাও।

তিনি হীরাকে পদাঘাত করিয়া প্রমোদ্যান হইতে বিদায় করিলেন। হীরা পাপিষ্ঠা—দেবেন্দ্র পাপিষ্ঠ এবং পশু। এইরূপ উভয়ের চিরপ্রেমের প্রতিশ্রুতি সফল হইয়া পরিণত হইল।

হীরা পদাহত হইয়া গৃহে গেল না। গোবিন্দপুরে একজন চণ্ডাল চিকিৎসা-ব্যবসা করিত। সে কেবল চণ্ডালাদি ইতরজাতির চিকিৎসা করিত। চিকিৎসা বা ঔষধ কিছুই জানিত না—কেবল বিষবড়ির সাহায্যে লোকের প্রাণসংহার করিত। হীরা সেই রাত্রে তাহার ঘরে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া গোপনে বলিল যে "একটা শেয়ালে রোজ আমার হাঁড়ি খাইয়া যায়। আমি সে শেয়ালটাকে না মারিলে তিষ্ঠিতে পারি না। মনে করিয়াছি, ভাতের সঙ্গে বিষ মিশাইয়া রাখিব—সে রোজ হাঁড়ি খাইতে আসিলে, বিষ খাইয়া মরিবে। তোমার কাছে অনেক বিষ আছে। সদ্যঃ প্রাণ নষ্ট হয়, এমন বিষ আমাকে বিক্রয় করিতে পার ?"

চণ্ডাল শিয়ালের গল্পে বিশ্বাস করিল না। বলিল—আমার কাছে যাহা চাহ তাহা আছে। কিন্তু আমি তাহা বিক্রয় করিতে পারি না।

হীরা বলিল—তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি যে বিক্রয় করিয়াছ, ইহা কেহ জানিবে না। দুইটা শিয়াল মরে, এতটা বিষ আমাকে দাও, আমি তোমাকে পঞ্চাশ টাকা দিব।

চণ্ডাল নিশ্চিন্ত মনে বুঝিল যে, এ কাহার প্রাণ বিনাশ করিবে। কিন্তু পঞ্চাশ টাকার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। বিষ বিক্রয়ে স্বীকৃত হইল। হীরা গৃহ হইতে টাকা আনিয়া চণ্ডালকে দিল, চণ্ডাল তীব্র মনুষ্যঘাতি হলাহল কাগজে মুড়িয়া হীরাকে দিল। হীরা গমন-কালে কহিল—দেখিও, একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না—তাহা হইলে আমাদের উভয়ের অমঙ্গল।

চণ্ডাল কহিল—না! আমি তোমাকে চিনিও না। হীরা তখন নিঃশঙ্ক হইয়া গৃহে গমন করিল।

গৃহে গিয়া মনে মনে কহিল, "আমি কি দোষে বিষ খাইয়া মরিব। যে আমাকে মারিল, আমি তাহাকে না মারিয়া আপনি মরিব কেন? এ বিষ আমি খাইব না। যে আমার এ দশা করিয়াছে, হয় সেই ইহা খাইবে, নইলে তাহার প্রেয়সী কুন্দনন্দিনী ইহা ভক্ষণ করিবে। ইহাদের একজনকে মারিয়া, মরিতে হয় পরে ˙ রিব।"

কলিকাতার আবশ্যক কার্য সমাপ্ত হইল। দানপত্র লিখিত হইল। তাহাতে ব্রহ্মচারীর এবং অজ্ঞাতনামা ব্রাহ্মণের পুরস্কারের বিশেষ বিধি রহিল। তাহা হরিপুরে রেজিষ্ট্রী হইবে, এই কারণে দানপত্র সঙ্গে করিয়া নগেন্দ্র গোবিন্দপুরে গেলেন। শ্রীশচন্দ্রকে যথোচিত যানে অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া গেলেন।

কমলমণি আগে গোবিন্দপুরে আসিলেন, দেখিয়া কুন্দনন্দিনীর বোধ হইল, আবার আকাশে একটি তারা উঠিল। যে অবধি সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ

করিয়া গিয়াছিলেন, সেই অবধি কুন্দনন্দিনীর উপর কমলমণির দুর্জ্জয় ক্রোধ; মুখ দেখিতেন না। কিন্তু এবার আসিয়া কুন্দনন্দিনীর শুষ্কমূর্ত্তি দেখিয়া কমলমণির রাগ দূর হইল,—দুঃখ হইল। নগেন্দ্র আসিতেছেন, সংবাদ দিয়া কুন্দের মুখে হাসি দেখিলেন। সূর্য্যমুখীর মৃত্যু সংবাদ কাজে কাজেই দিতে হইল। শুনিয়া কুন্দ কাঁদিল।

পরিশেষে নগেন্দ্র আসিয়া পোঁছিলেন, তখন সন্ধ্যাকাল। প্রাচীন ভৃত্যেরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়া আপনা আপনি রোদন করিল; নগেন্দ্র কেবল একজনকে মনঃপীড়া দিলেন। চিরদুঃখিনী কুন্দনন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না।

যখন নগেন্দ্রের চৈতন্য প্রাপ্তি হইল, তখনও শয্যাগৃহে নিবিড়ান্ধকার ক্রমে ক্রমে তাঁহার সংজ্ঞা পুনঃসঞ্চিত হইতে লাগিল। যখন মূর্চ্ছার কথা সকল স্মরণ হইল, তখন বিস্ময়ের উপর আরও বিস্ময় জন্মিল। তিনি ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তবে তাঁহার শিরোদেশে উপাধান কোথা হইতে আসিল? আবার এক সন্দেহ —এ কি বালিশ? বালিশ স্পর্শ করিয়া দেখিলেন—এ ত বালিশ নহে; কোন মনুষ্যের উরুদেশ। কোমলতায় বোধ হইল, স্ত্রীলোকের উরুদেশ। কে আসিয়া মূর্চ্ছিত অবস্থায় তাঁহার মাথা তুলিয়া উরুতে রাখিয়াছে? এ কি কুন্দনন্দিনীর? সন্দেহভঞ্জনার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" তখন শিরোরক্ষকারিণী কোন উত্তর দিল না—কেবল দুই তিন বিন্দু উষ্ণ বারি নগেন্দ্রের কপাল দেশে পড়িল। নগেন্দ্র বুঝিলেন, যেই হউক, সে কাঁদিতেছে। উত্তর না পাইয়া নগেন্দ্র তাহার অঙ্গস্পর্শ করিলেন। তখন অকস্মাৎ নগেন্দ্র বুদ্ধি-ভ্রষ্ট হইলেন, তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি নিশ্চেষ্ট জড়ের মত ক্ষণকাল পড়িয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে রুদ্ধনিঃশ্বাসে রমণীর উরুদেশ হইতে মাথা তুলিয়া বসিলেন।

রমণী কি বলিল, কপালদোষে নগেন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

কিন্তু কথার শব্দ যেন নগেন্দ্রর কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনি তিনি তীরবৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন ; এবং দণ্ডায়মানা স্ত্রীলোককে বক্ষে ধারণ করিতে গেলেন। কিন্তু তখন মন ও শরীর দুই-ই মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছে—পুনর্ব্বার বৃক্ষচ্যুত বল্লীবৎ সেই মোহিনীর পদপ্রান্তে পড়িয়া গেলেন। আর কথা কহিলেন না।

রমণী আবার উরুদেশে মস্তক তুলিয়া লইয়া বসিয়া রহিলেন। যখন নগেন্দ্র মোহ বা নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন, তখন দিনোদয় হইয়াছে। গৃহমধ্যে আলো।

তখনও নগেন্দ্র দেখিলেন, কাহার উরুদেশে তাঁহার মস্তক রহিয়াছে। চক্ষু না চাহিয়া বলিলেন, "কুন্দ, তুমি কখন আসিলে? আমি আজ সমস্ত রাত্রি সূর্য্যমুখীকে স্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, সূর্য্যমুখীর কোলে মাথা দিয়া আছি। তুমি যদি সূর্য্যমুখী হইতে পারিতে, তবে কি সুখ হইত!"

রমণী বলিল, "সেই পোড়ারমুখীকে দেখিলে যদি তুমি অত সুখী হও, তবে আমি সেই পোড়ারমুখীই হইলাম।"

নগেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন। চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। চক্ষু মুছিলেন। আবার চাহিলেন। মাথা ধরিয়া রহিলেন। আবার চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তখন পুনশ্চ মুখাবনত করিয়া মৃদু মৃদু আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "আমি কি পাগল হইলাম—না সূর্য্যমুখী বাঁচিয়া আছেন? শেষে এই কি কপালে ছিল? আমি পাগল হইলাম। এই বলিয়া নগেন্দ্র ধরাশায়ী হইয়া বাহুমধ্যে চক্ষু লুকাইয়া আবার কাঁদিতে লাগিলেন।

আর কি ভ্রম থাকে? তখন নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং তাহার বক্ষে মস্তক রাখিয়া বিনা বাক্যে অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন। তখন উভয়ে উভয়ের স্কন্ধে মস্তক ন্যস্ত করিয়া কত রোদন করিলেন। কেহ কোন কথা বলিলেন না।

যথাসময়ে সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের কৌতূহল নিবারণ করিলেন। বলিলেন, "আমি মরি নাই—কবিরাজ যে আমার মরার কথা বলিয়াছিলেন—সে মিথ্যা কথা। কবিরাজ জানেন না। আমি তাঁহার চিকিৎসায় সবল হইলে, তোমাকে দেখিবার জন্য গোবিন্দপুরে আসিবার কারণ নিতান্ত কাতর হইলাম। ব্রহ্মচারীকে ব্যতিব্যস্ত করিলাম। শেষে তিনি আমাকে গোবিন্দপুরে লইয়া আসিতে সম্মত হইলেন। একদিন সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া তাঁহার সঙ্গে গোবিন্দপুরে আসিবার জন্য যাত্রা করিলাম। এখানে আসিয়া শুনিলাম যে তুমি দেশে নাই। ব্রহ্মচারী আমাকে এখান হইতে তিন ক্রোশ দূরে, এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আপন কন্যা পরিচয়ে রাখিয়া তোমার উদ্দেশ্যে গেলেন। তিনি আবার মধুপুরে গেলেন। মধুপুরে জানিলেন যে, যে দিন আমরা হরমণির বাটি হইতে আসি, সেই দিনই তাহার গৃহদাহ হইয়াছিল। হরমণি গৃহমধ্যে পুড়িয়া মরিয়াছিল। প্রাতে লোকে দগ্ধ দেহ দেখিয়া চিনিতে পারে নাই। তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, এ গৃহে দুইটি স্ত্রীলোক থাকিত, তাহারা পলাইয়া বাঁচিয়াছে—আর একটি পুড়িয়া মরিয়াছে। যে পলাইয়াছে, সেই সবল ছিল; যে রুগ্ন, সে পলাইতে পারে নাই। এইরূপ তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, হরমণি পলাইয়াছে, আমি মরিয়াছি। যাহা প্রথমে অনুমান মাত্র ছিল, তাহা জনরবে ক্রমে নিশ্চিন্ত বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম—কেহ আমাকে দেখিল না; সিঁড়ির নিচে লুকাইয়া রহিলাম। পরে সকলে শুইলে সিঁড়িতে উঠিলাম; মনে ভাবিলাম, তুমি অবশ্য এই ঘরে শয়ন করিয়া আছ। দেখিলাম, এই দুয়ার খোলা। দুয়ারে উঁকি মারিয়া দেখিলাম—তুমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছ। বড় সাধ হইল তোমার পায়ে লুটাইয়া পড়ি কিন্তু আবার কত ভয় হইল—তোমার কাছে যে অপরাধ করিয়াছি—তুমি যদি ক্ষমা না কর? আমি ত তোমাকে কেবল দেখিয়াই তৃপ্ত। কপাটের আড়াল হইতে দেখিলাম ভাবিলাম, এই সময়ে দেখা দিই। দেখা দিবার জন্য আসিতেছিলাম—

কিন্তু দুয়ারে আমাকে দেখিয়াই তুমি অচেতন হইলে। সেই অবধি কোলে লইয়া বসিয়া আছি। এ সুখ যে আমার কপালে হইরে তাহা জানিতাম না। কিন্তু ছি! তুমি আমায় ভালবাস না।

যখন শয়নাগারে ভাসিতে ভাসিতে নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখী এই প্রাণ-স্নিগ্ধকর কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন সেই গৃহের অংশান্তরে এক প্রাণসংহারক কথোপকথন হইতেছিল। কিন্তু তৎপূর্বে পূর্বরাত্রের কথা বলা আবশ্যক।

বাটী আসিয়া নগেন্দ্র কুন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। কুন্দ আপন শয়নাগারে সমস্ত রাত্রি রোদন করিল।

সমস্ত রাত্রি জাগরণ এবং রোদনের পর প্রভাতকালে কুন্দের তন্দ্রা আসিল। কুন্দ তন্দ্রাভিভূত হইয়া দ্বিতীয়বার লোমহর্ষক স্বপ্ন দেখিল।

দেখিল, চারি বৎসর পূর্বে পিতৃভবনে পিতার মৃতুশয্যাপার্শ্বে শয়নকালে যে জ্যোতির্ময়ী মূর্তি তাহার মাতার রূপ ধারণ করিয়া স্বপ্নাবির্ভূতা হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই আলোকময়ী প্রশান্তমূর্ত্তি আবার কুন্দের মস্তকোপরি অবস্থান করিতেছেন। আর দেখিল, মাতা করুণাময়ী কান্তি এক্ষণে গভীরভাবাপন্ন! মাতা কহিলেন, "কুন্দ! তখন আমার কথা শুনিলে না, আমার সঙ্গে আসিলে না—এখন দুঃখ দেখিলে ত?" বলিয়াছিলাম আর একবার আসিব! তাই আবার আসিলাম। এখন যদি সংসার সুখে পরিতৃপ্তি জন্মিয়া থাকে, তবে আমার সঙ্গে চল।"

তখন কুন্দ কাঁদিয়া কহিল, "মা তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। আমি আর এখানে থাকিতে চাহি না।"

ইহা শুনিয়া মাতা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "তবে আইস।"

এই বলিয়া তেজোময়ী অন্তর্হিতা হইলেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে, কুন্দ স্বপ্ন স্মরণ করিয়া দেবতার নিকট ভিক্ষা চাহিল যে, "এবার আমার স্বপ্ন সফল হউক।"

হীরা জিজ্ঞাসা করিল, "মা ঠাকুরাণী কাঁদিতেছ কেন?"

কুন্দ কথা কহিল না। হীরার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিল। হীরা দেখিল, কুন্দের চক্ষু ফুলিয়াছে, বালিশ ভিজিয়াছে। হীরা কহিল, "এ কি? সমস্ত রাত্রিই কেঁদেছ নাকি? আমার মত যদি তোমাকে সহিতে হইত—তবে এত দিনে তুমি আত্মহত্যা করিতে।"

হীরা বলিতে লাগিল, 'তবে আমার দুঃখের কথা বলি, শুন। আমিও একজনকে আপনার প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতাম। সে আমার স্বামী নহে—কিন্তু যে পাপ করিয়াছি, তাহা মনিবের কাছে লুকাইলেই বা কি হইবে—স্পষ্ট স্বীকারই ভাল।'

এইরূপে আরম্ভ করিয়া হীরা সংক্ষেপে কুন্দের নিকট আপনার দারুণ ব্যথার পরিচয় দিল। শেষে পদাঘাতের কথা বলিয়া কহিল, "বল দেখি, তাহাতে আমি কি করিলাম?"

কুন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "কি করিলে?" হীরা হাত-মুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "আমি তখনই চাড়াল কবিরাজের বাড়ীতে গেলাম। তাহার নিকট এমন সব বিষ আছে যে খাইবামাত্রই মানুষ মরিয়া যায়।'

কুন্দ ধীরতার সহিত, মৃদুতার সহিত কহিল, "তারপর?"

হীরা কহিল, "আমি বিষ খাইয়া মরিব বলিয়া বিষ কিনিয়াছিলাম কিন্তু শেষে ভাবিলাম যে, পরের জন্য আমি মরিব কেন? ইহা ভাবিয়া বিষ কৌটায় পুরিয়া বাক্সতে তুলিয়া রাখিয়াছি।"

এই বলিয়া হীরা কক্ষান্তর হইতে তাহার বাক্স আনিল। সেই বাক্সটি হীরা মুনিব বাড়ির প্রাসাদ, পুরস্কার এবং অপহরণের দ্রব্য লুকাইবার জন্য সেইখানে রাখিত।

হীরা সেই বাক্সতে নিজক্রীত বিষের মোড়ক রাখিয়াছিল।

বাক্স খুলিয়া হীরা কৌটার মধ্যে বিষের মোড়ক কুন্দকে দেখাইল। আমিষলোলুপ মার্জ্জারবৎ কুন্দ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। হীরা তখন যেন অন্যমনস্কবশতঃ বাক্স বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়া কুন্দকে প্রবোধ দিতে লাগিল। এমন সময় অকস্মাৎ সেই প্রাতঃকালে, নগেন্দ্রের

পুরীমধ্যে মঙ্গলজনক শঙ্খ এবং হুলুধ্বনি উঠিল। বিস্মিত হইয়া হীরা ছুটিয়া দেখিতে গেল। মন্দভাগিনী কুন্দনন্দিনী সেই অবকাশে কৌটা হইতে বিষের মোড়ক চুরি করিল।

নগেন্দ্র আসিলে বধূরা ডাকিতেছে বলিয়া তাঁহাকে কুন্দের ঘরে দেখাইয়া দিলেন। নগেন্দ্র তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বারে সূর্য্যমুখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সূর্য্যমুখী রোদন করিতেছিলেন। নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "সর্বনাশ হইয়াছে।"

"কুন্দকে আমি বালিকা সময় হইতেই মানুষ করিয়াছি, এখন সে আমার ছোট ভগিনী, তাহাকে আদর করিব, সাধ করিয়া আসিয়াছিলাম, আমার সে সাধে ছাই পড়িল। কুন্দ বিষপান করিয়াছে।"

নগেন্দ্র। সে কি!

এই বলিয়া সূর্য্যমুখী নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নগেন্দ্র একাকী কুন্দনন্দিনীর নিকটে গেলেন।

নগেন্দ্র প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কুন্দনন্দিনীর মুখে কালিমা ব্যাপ্ত হইয়াছে। চক্ষু তেজোহীন, শরীর অবসন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

নগেন্দ্র নিকটে দাঁড়াইলে, কুন্দ ছিন্নবল্লীবৎ তাঁহার পদপ্রান্তে মাথা লুটাইয়া পড়িল। নগেন্দ্র গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, "এ কি কুন্দ! তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ?"

কুন্দ স্বামীর কথায় উত্তর করিল না—আজ সে অন্তিমকালে স্বামীর সঙ্গে কথা কহিল—তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়াছ?

নগেন্দ্র তখনি নিরুত্তর হইয়া, আধোবদনে কুন্দনন্দিনীর নিকটে বসিলেন। কুন্দ তখন আবার কহিল; "কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে,—কাল যদি একবার আমার নিকটে এমনি করিয়া বসিতে তবে আমি মরিতাম না। আমি অল্পদিন মাত্র তোমাকে পাইয়াছি—তোমাকে দেখিয়া আমার আজিও তৃপ্তি হয় নাই। আমি মরিতাম না।"

নগেন্দ্র মর্ম্মপীড়িত হইয়া কাতর স্বরে কহিলেন, "কেন তুমি এমন কাজ করিলে? তুমি আমায় একবার কেন ডাকিলে না।"

নগেন্দ্র কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। আজ তিনি বালিকা, অবাকপটু কুন্দনন্দিনীর নিকট নিরুত্তর হইলেন।

কুন্দ ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। তাহার কথা কহিবার শক্তি অপহৃত হইতেছিল। মৃত্যু তাহাকে অধিকৃত করিতেছিল।

ডাক্তার আসিল। দেখিয়া শুনিয়া ঔষধ দিল না—আর ভরসা নাই দেখিয়া ম্লানমুখে প্রত্যাবর্তন করিল।

পরে সময় আসন্ন বুঝিয়া, কুন্দ সূর্য্যমুখী ও কমলমণিকে দেখিতে চাহিল। তাঁহারা উভয়ে আসিলে কুন্দ তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিল। তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেন।

তখন কুন্দনন্দিনী স্বামীর পদযুগলমধ্যে মুখ লুকাইল। তাহাকে নীরব দেখিয়া দুইজনে আবার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। কিন্তু কুন্দ আর কথা কহিল না। ক্রমে ক্রমে চৈতন্যভ্রষ্টা হইয়া চরণমধ্যে মুখ রাখিয়া, নবীন যৌবনে কুন্দনন্দিনী প্রাণত্যাগ করিল।

প্রথমে রোদন সংবরণ করিয়া সূর্য্যমুখী মৃতা সপত্নীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "ভাগ্যবতী! তোমার মত প্রসন্ন অদৃষ্ট আমার হউক। আমি যেন এইরূপে স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করি।"

এই বলিয়া সূর্য্যমুখী রোরুদ্যমান স্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেলেন! পরে নগেন্দ্র ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্বক কুন্দকে নদীতীরে লইয়া যথাবিধি সৎকারের সহিত সেই অতুল স্বর্ণপ্রতিমা বিসর্জন করিয়া আসিলেন।

সমাপ্ত